চা, কফি
আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স

নাঈম হোসেন ফারুকী

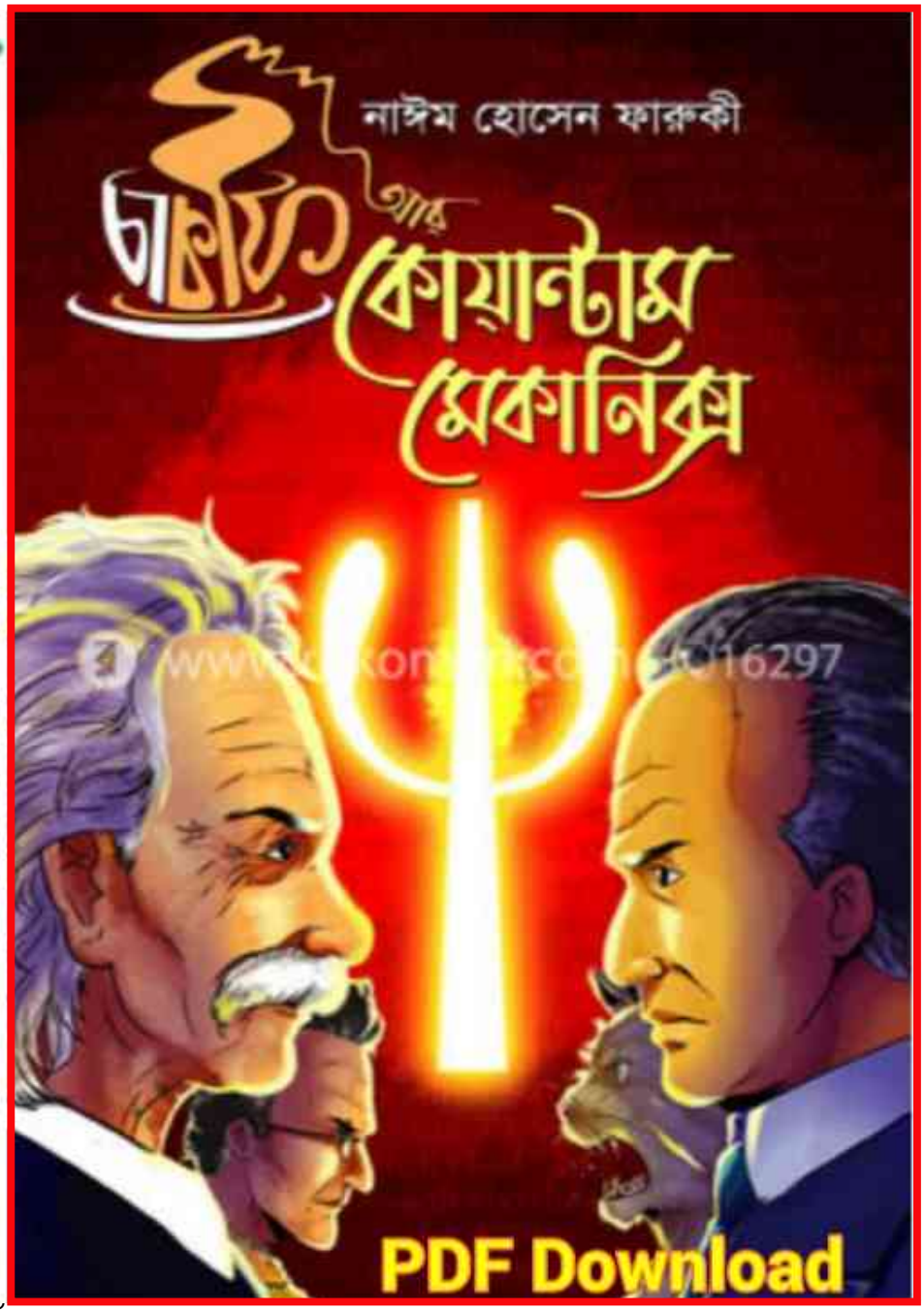

সম্পাদনা:
সমুদ্র জিৎ সাহা
সুস্মিত ইসলাম

ছবি ও গ্রাফ:
সুস্মিত ইসলাম
মেহরাব সিদ্দিক সাবিত
সমুদ্র জিৎ সাহা
তানভির রানা বাব্বি
নাঈম হোসেন ফারুকী

প্রচ্ছদ:
মৌমিতা সিদ্দিক

বিশেষ কৃতজ্ঞতা:
দীপায়ন তূর্য (ভুল সংশোধন ও রিভিউ)
ফাহিম উদ্দীন (ভুল সংশোধন ও রিভিউ)
জুবায়ের হোসেন (ভুল সংশোধন ও রিভিউ)
মেহমুদা অর্পা (রিভিউ)
হৃদয় ইক (নামকরণ)

স্বত্ব:
লেখক

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া
জ্যোৎস্না ধরিতে যাই
আমার হাত ভর্তি চাঁদের আলো
ধরতে গেলেই নাই!

- হুমায়ূন আহমেদ

উৎসর্গ

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন↓
https://www.purepdfbook.com

আমার নানীকে
যাকে আমি আম্মা বলি
যার লেখাপড়া মেট্রিক পর্যন্ত
যে আমাকে ছোটবেলায় রূপকথার গল্প শোনায় নি
আমার চার বছর বয়সে হাতে বল দিয়ে বলেছিল,
পৃথিবীটা এই বলের মতো গোল, সেটা সূর্যের চারপাশে ঘুরছে
আর প্রথম যে তিনজন মানুষ চাঁদে গিয়েছিল তাদের নাম
নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স আর অল্ড্রিন।

সূচিপত্র

- উপক্রমণিকা
- আলুর বস্তা আর আলোর প্যাকেট
- ফাউন্ডিং ফাদারস
- পরমাণুর গল্প: প্রথম যুগ
  - আইন্সটাইনের অ্যাটম, টমসনের পুডিং
  - রাদারফোর্ডের আগমন
  - রাদারফোর্ডের একান্ত সাক্ষাৎকার
  - ব্যাক টু দ্যা ফিল্ড
  - পাটকেল বিটকেল পার্টিকেল
  - একটা বোরিং গল্প
  - বোরের বর্ণালি
  - রঙের গল্প
  - সমারফিল্ডের মডেল
  - স্পিন: কি এই জিনিস?
- চা পানের বিরতি ১: কোয়ান্টামে কুপোকাৎ
- তরঙ্গ বলবিদ্যা
  - ইয়াং এর তরঙ্গ
  - ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট
  - ডি ব্রগলির দ্বিচির
  - ফোটনের দুঃখের জীবন
  - ভরের জন্ম
  - ডি ব্রগলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য
  - কণা কোথায় থাকে?
  - কণা-তরঙ্গ দ্বৈততা
  - ডি ব্রগলির পরমাণু
- চা পানের বিরতি ২: ভার্নার হাইজেনবার্গ
- অনিশ্চয়তার নীতি
  - ওয়েভ ফাংশন কল্যাপ্স
  - সুনিশ্চিত জগৎ?
  - হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্র
  - কোন পথে কণা চলে?
- চা পানের বিরতি ৩: লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার
- স্টেট আর কম্পিউটার
  - স্টেট আর সুপারপজিশন
  - কোয়ান্টাম কম্পিউটার
  - জটিল স্টেট
- চা পানের বিরতি ৪: সলিড
- ফার্মিওন আর বোজোন
  - নক্ষত্র আর ব্ল্যাক হোল: পলির নীতি
  - ফাইনম্যানের টাইম মেশিন
  - বোজোন
  - বোজোন কেন একসাথে থাকে?
  - ফার্মিওন: পলির অপবর্জন নীতি
- চা পানের বিরতি ৫: কত বড় একটা ইলেকট্রন?
- শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ
  - একটা ψকোলজিক্যাল থ্রিলার
  - জটিল তরঙ্গ
  - ψএর সমীকরণ

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন↓
https://www.purepdfbook.com

    - ফান্দে পরিয়া কণা কান্দে
    - কোয়ান্টাম টানেলিং
    - কণা কোথায় থাকবে?
- চা পানের বিরতি ৬: ব্যাঙ্ক নোটে বিজ্ঞানীরা
- পর্দার ওপারে
    - কোপেনহ্যাগেন ইন্টারপ্রিটেশান
    - শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল
    - ই পি আর প্যারাডক্স
    - বেলের অসমতা
    - এনট্যাঙ্গেলমেন্ট
    - সিমিউলেটেড ইউনিভার্স
    - কণার অতীত কি হবে?
- চা পানের বিরতি ৭: মাল্টিভার্সে আইন্সটাইন
- মাল্টিভার্স আর সুপারডিটারমিনিজম
    - প্যারালাল দুনিয়ার আগন্তুক?
    - জাত বেজাতের মাল্টিভার্স
    - স্ট্রিং থিওরির মাল্টিভার্স
    - মেনি ওয়ার্ল্ড ইন্টারপ্রিটেশান
    - সুপারডিটারমিনিজম
- উপসংহার
- রেফারেন্স
- পরিশিষ্ট
    - $E^2 = (m_0c^2)^2 + (pc)^2$ প্রমাণ
    - টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ প্রতিপাদন
    - টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ সমাধান
    - টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ প্রতিপাদন
    - বেলের অসতার গাণিতিক প্রমাণ

উপক্রমণিকা

“পরমাণু বা মৌলিক কণাগুলো সত্যিকারের জিনিস না। যে জগতে তারা বাস করে সেখানে সত্যিকারের জিনিস থাকে না, থাকে শুধু সম্ভাবনা।”
- ভার্নার হাইজেনবার্গ

১।

সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে যদি কেউ বলে সীতা কার বাপ, কেমন লাগে?

এই সিরিজ লিখতাম ফেসবুকে বসে বসে। কয়েকদিন পর পর একটা একটা করে পর্ব লিখতাম, দুই চারটা উৎসাহী ছেলেপেলে একটা দুইটা লাইক কমেন্ট দিয়ে যেত, আমার বেশ লাগতো।
কাহিনী হলো কয়েকদিন পর।

কোয়ান্টাম আট পর্ব লিখে ফেলেছি, আট নাম্বার পর্বে এসে একজন কমেন্ট করল, ভাই কোয়ান্টাম খুব ভাল জিনিস, আমি নিজেও অনেকদিন থেকে কোয়ান্টামে ভর্তি হতে চাচ্ছি, টাইম পাচ্ছি না। পরীক্ষা শেষ হলেই ভর্তি হয়ে যাব!

আমি টানা কয়েক সেকেন্ড টাসকী খেয়ে বসে থাকলাম। বলে কী এই ছেলে?!! একটু পর পানি টানি খেয়ে একটু সিধা হলাম। মাথায় ঢুকল আসলে কী হয়েছে।

তোমার কাছের বইয়ের দোকানটায় যাও। কোয়ান্টামের বই চাও। দেখো কি দেয়!

রকমারি.কমে যাও।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

ইংরেজিতে quantum লিখে সার্চ দাও।

কি আসে?

দুই নাম্বারেঃ ভাঙো দুর্দশার চক্র!

তিন নাম্বারেঃ সাফল্যের চাবিকাঠি! মহাজাতক!! কোয়ান্টাম মেথড!!!

ছয় নাম্বারেঃ আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র! কোয়ান্টাম কণিকা!!!

সাত আর আট নাম্বারেঃ সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন! এইটার আবার দুইটা ভার্শন। একটা ভাল প্রিন্ট, আরেকটা সেবার পচা কাগজে প্রিন্ট!

বুঝতে পারছ কিছু?

সারা পৃথিবী কোয়ান্টাম বলতে বুঝে ছোট ছোট কণাদের কেচ্ছা কাহিনী।

বাঙ্গালি বুঝে কোয়ান্টাম মানে ধ্যান।

মেডিটেশন।

শুধু কি ধ্যান? দুর্দশার চক্র ভাঙতে পারে কোয়ান্টাম। কোয়ান্টাম হলো জাতক, মহাজাতক!!

ভাবছি কোয়ান্টামের মতো বিজ্ঞানের অন্যান্য ফিল্ডগুলো এভাবে দখল করে নিলে কি হবেঃ

- ম্যাক্সওয়েল কবিতা লেখার সূত্র। ম্যাক্সওয়েলিয় পদ্ধতিতে গীতাঞ্জলী-২ লিখুন, নোবেল প্রাইজ জিতুন।
- দি নিউটন ছাগল পালন পালন কেন্দ্র। প্রত্যেক ছাগলের একটি সমান ও বিপরীত পাগল আছে।
- অয়লার ফর্মুলা। অল ইজ অয়েল।

যাকগে এবার কাজের কথায় আসি। চা কফি আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স ধ্যানের গল্প নয়, উন্নত জীবনের গল্প নয়। এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গল্প। তুমি, আমি, রাস্তার ধূলিকণা, আকাশের নক্ষত্র সবগুলোই অতি ক্ষুদ্র কিছু কণা দিয়ে তৈরি। এদের ইংরেজি নাম পার্টিকেল। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এগুলো সব ছোট ছোট পার্টিকেল। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই কণাগুলোর গল্প বলে।

আমরা ভুতের গল্প শুনেছি, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের গল্প শুনেছি। এই কণাগুলোর গল্প যেকোনো ভুতের গল্প থেকে বেশি রহস্যময়। বিজ্ঞান এই চরম ভূতুরে ব্যাপারগুলো শুধু মেনেই নেয় না, এদেরকে ব্যাবহারও করে। তোমার হাতের মোবাইল, পাশের ল্যাপটপ, প্রতিটা ইলেক্ট্রনিক জিনিস এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দান।

২।

কেন এই বই?

নিচের ছবিটা দেখেছ? হিজিবিজি কয়েকটা লেখা, ছাতার মতো কিছু চিহ্ন? দুর্বোধ্য কিছু গ্রিক অক্ষর?

$$E\psi = -\frac{[?][?]^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi$$

ওইটা শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যেকোন টেক্সট বই এরকম হাজার হাজার বিদ্ঘুটে সব সমীকরণের সমষ্টি। ওই সমীকরণের আড়ালে, দুর্বোধ্য

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

হায়ারোক্লিফিক্স অক্ষরে লেখা আছে পৃথিবীর সবচেয়ে অসাধারন গোয়েন্দা কাহিনীগুলো। যেকোন ভূতের গল্প, সায়েন্স ফিকশনকে হার মানায় ওইসব গল্প।

খুদে কণাগুলো নাকি আলাদিনের জ্বিনের মত শুন্য থেকে হুট করে জন্ম নিতে পারে।

শুন্যে মিলিয়ে যেতে পারে।

একই সাথে দুই জায়গায় থাকতে পারে। আবার একই জায়গায় নাকি দুইজন থাকতে পারে।

দেয়াল ফুটা করে যেতে পারে। আবার বহু আলোকবর্ষ দূরে তার ভাইয়ের সাথে আলোর বেশি বেগে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ করতে পারে!

কোয়ান্টাম থেকে জন্ম হয়েছে মাল্টিভার্সের ধারনা। কেউ কেউ বলে, প্রত্যেকবার যখন কোন একটা কণাকে দেখার চেষ্টা করা হয় অনেকগুলো নতুন ইউনিভার্সের জন্ম হয়।

কোয়ান্টাম ধারণা দেয় সিমুলেটেড দুনিয়ার। কেউ কেউ বলে, কোন কিছুই নাকি আগে থেকে ঠিক নেই, তুমি যখন দেখ, গেইমের দুনিয়ার মতো চারপাশে লোড হয় তোমার চারপাশের জগৎ।

৩।

ড্রেসিং রুমে বসানো হয়েছে পাঞ্জার টেবিল। সেখানে লড়ছেন আইন্সটাইন আর নীলস বোর। কেউ কাউকে হাড়াতে পারছেন না।

লর্ড রাদারফোর্ড লম্বা গাউন পরে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারী করছেন। ধোয়া বের হচ্ছে তাঁর পাইপ থেকে।

হাইজেনবার্গ এখনো এসে পৌঁছান নি, কখন আসবেন ঠিক বলা যাচ্ছে না। হয়তো সম্রাটের ক্যাসিনোতে জুয়া খেলছেন। হয়তো মতিঝিলের জ্যামে আটকে আছেন। তাঁর সব কিছুতেই অনিশ্চয়তা।

বোস বাবু কিছুটা বিরক্ত। তাঁর বোজোনগুলো কিছুতেই এক জায়গায় থাকছে না। ছুটাছুটি করছে। এই নিয়ে ফার্মির সাথে তুমুল তর্ক হচ্ছে তাঁর। বেয়াদব ফার্মিওনগুলোর সাথে মিশে বোজোনগুলো খারাপ হয়ে গেছে।

ফাইনম্যান এখনো এসে পৌঁছান নি, কিন্তু তাঁর টাইম মেশিন আছে। টেনশন কম।

নিষ্ঠুর বিড়ালমানব আরভিন শ্রোডিঙ্গার মিটিমিটি হাসছেন। বিড়ালটাকে খাঁচায় ঢুকিয়ে সায়ানাইড খাওয়ানোর নীল নক্সা খেলা করছে তাঁর মনে। পাশে স্বদন্ত বের করে রাগি চেহারায় গর্জন করছে তার বিড়ালটা।

মঞ্চের পেছনে শিধ কাটছেন বক্কর ভাই। কোয়ান্টাম টানেলিং এর একটা ট্রায়াল হয়ে যাচ্ছে।

এই সব কিছু ভুলে, এক কোণায় বসে একমনে অংক করে চলেছেন পল ডিরাক। তাঁকে অনেক কষ্ট করে অভিনয়ে রাজি করা হয়েছে। মঞ্চে যেয়েও টেবিলে বসে শুধু অংকই করবেন, এই শর্তে অভিনয়ে আসতে রাজি হয়েছেন তিনি।

সময় হয়ে গেছে, একটু পর পর্দা উঠবে। হল ভর্তি হাজার হাজার দর্শক, চোখে মুখে তাদের টান টান উত্তেজনা।

তো, হয়ে যাক তাহলে?

এই বই পড়তে হলে:
১। চিন্তা করাকে ভালবাসতে হবে।
২। ছক্কা, লুডু, কয়েন টসিং এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে।
৩। 'উপক্রমণিকা' টাইপের কঠিন শব্দগুলোর প্রটি অ্যালার্জি থাকতে হবে।
৪। অন্তত নাইন টেনের ম্যাথ/ফিজিক্স বুঝতে হবে।
৫। গ্রাফ সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

কিছু চিহ্ন আর তাদের মানে:

	চিন্তা করতে বলা হচ্ছে। বাঁচতে হলে ভাবতে হবে।
	এটাও বাঁচতে হলে ভাবতে হবে। সেকেন্ড ভার্শন।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

	সামনে বিপজ্জনক সমীকরণ। পড়তে না চাইলে স্কিপ কর।
	সমীকরণ শেষ। এবার রিল্যাক্স করা যায়।
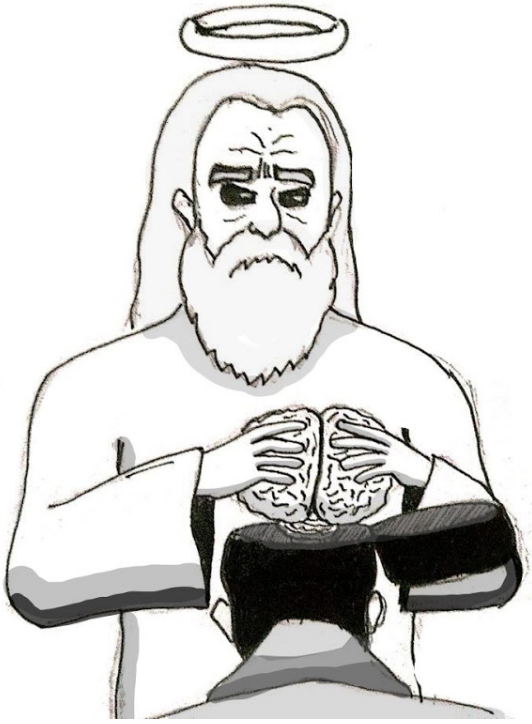	সামনে জটিল চ্যাপ্টার। মাথায় ব্রেইন পরে নাও।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

আলুর বস্তা আর আলোর প্যাকেট

"We have no right to assume that any physical laws exist, or if they have existed up until now, that they will continue to exist in a similar manner in the future."
-Max Planck

১।
ম্যাক্স প্লাঙ্ক আইন কানুন খুব ভালবাসেন। তাঁর জীবন চলে সময় মেপে মেপে, নিয়ম ফলো করে।
ঠিক সকাল আটটায় তিনি সকালের নাশতা করেন। তারপর দুপুর পর্যন্ত টানা কাজ। সন্ধ্যার পর রুটিন করে আড্ডা। ছুটিতে রুটিন করে পাহাড়ে ওঠা।

আর একটা জিনিস তিনি খুব ভালবাসেন। সেটা হচ্ছে পিয়ানো। ম্যাক্স প্ল্যাংক নিখুঁত পিয়ানিস্ট, তাঁর বাজনা শুনতে হাজির হন নামি দামি প্রফেশনালরা। প্ল্যাঙ্ক নিজে কিন্তু অসম্ভব খুঁতখুঁতে, অন্য কারো বাজনা তাঁর পছন্দ হয় না। একটা ভুল পিচ শুনলে তাঁর ভ্রু কুঁচকে ওঠে।

এই মুহূর্তে প্ল্যাঙ্কের ভ্রু পার্মানেন্টলি কুঁচকে আছে। পিয়ানো নিয়ে না, ব্যাপার তার চেয়েও সিরিয়াস। কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের হিসাব মিলছে না। অসীম মান আসছে।
মনে হচ্ছে হতচ্ছারা কৃষ্ণবস্তুর অসীম পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করা উচিত। এই জিনিস অসম্ভব, কখনই হতে পারে না। প্রকৃতি অসীম জিনিসটা ঘৃণা করে। তারপরো হিসাব করে বারবার অসীম মান আসছে।

প্ল্যাঙ্ক মাপলেন। পরীক্ষার রেজাল্ট ঠিকই আছে। কোন অসীম রেজাল্ট নাই। কিন্তু খাতাকলমে হিসাব মিলছে না।
প্ল্যাংক ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। হিসাবে ভুলটা কোথায়?

চলো দেখে আসি ঝামেলাটা কোথায়।

কৃষ্ণবস্তু কী জিনিসঃ

কৃষ্ণবস্তু হচ্ছে একটা জিনিস যে সব রকম কম্পাঙ্কের আলো খায়। লাল আলো খায়, নীল আলো খায়, হলুদ আলো খায়। অদৃশ্য আলোও খায়।

যে সব রকম আলো খায় সে নিজে হওয়ার কথা অন্ধকার। কুচকুচা কালো জিনিস, ভ্যান্টাব্ল্যাকের গুড়া, ছোট্ট ফুটাওয়ালা গোল জিনিস ভালো কৃষ্ণবস্তু। অবশ্য তার মানে এই না যে কৃষ্ণবস্তু হলেই তাকে কালো হতে হবে। টাকার লোভ গরীবদের যতটা থাকে, ধনীর তার চেয়ে বেশি থাকে। আমাদের সূর্য ঝকঝকা সাদা, কিন্তু মনটা তার অতি কালো। মনে মনে সে কৃষ্ণবস্তু। সেও সব ধরণের আলো খায়।

শুধু আলো খেলেই তো হবে না, আলো ছাড়তেও হবে। কৃষ্ণবস্তু খায় আবার ত্যাগ করে। সাধারণ তাপমাত্রায় সে ইনফ্রারেড আলো ছাড়ে, তাই মোটামুটি অন্ধকার থাকে। তাপমাত্রা বাড়ালে সে নানান রঙের আলো ছাড়ে, তার রূপের জেল্লা ছড়ায়।

ভালো কথা, তো ঝামেলা কোন জায়গায়?
ঝামেলা হচ্ছে, র‍্যালে জিন্স এর সূত্র বলছে, কৃষ্ণবস্তুর উচিত সব রকম কম্পাঙ্কের আলো দেওয়া। তাপমাত্রা বাড়লে বেশি কম্পাঙ্কের আলো বেশি করে দিবে, কিন্তু সবই একটু করে দিবে।
কিন্তু কম্পাংকের তো কোন সীমা নাই। সেটা তো অসীম।
তার উপর, যত বেশি কম্পাঙ্ক তত শক্তি।
ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, একটা ব্যাঙ্কে সব রকম টাকার নোট ছাড়ে। এক টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা, ... এক কোটি টাকা, এক কোটি এক টাকা, এক কোটি দুই টাকা, আর যত ভাবতে পারো। সব রকম নোট একটা করে নিলেও তো তোমার টাকা অসীম হয়ে যায়!

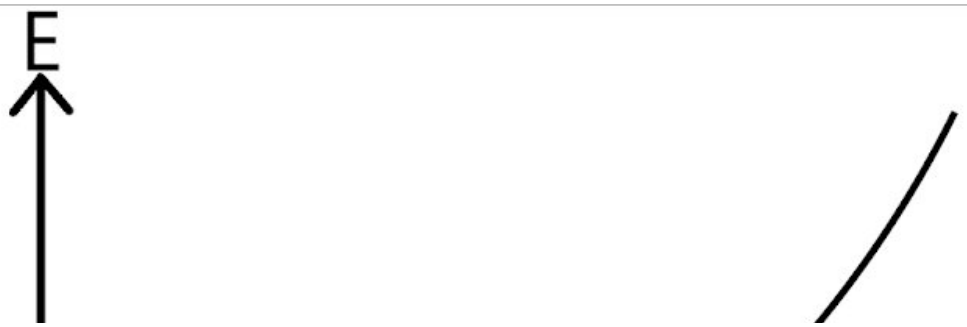

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

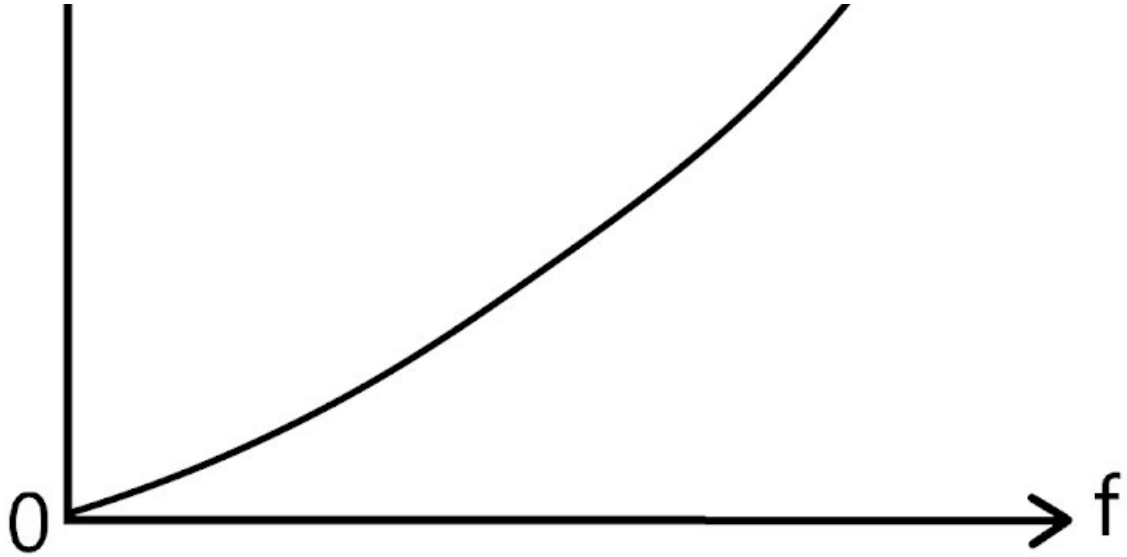

বুঝাই যাচ্ছে, এরকম ফালতু জিনিস প্রকৃতি অ্যালাও করবে না। আসলে যে জিনিস হয় সেটা হচ্ছে, কোন একটা তাপমাত্রায় একটা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের জন্য শক্তি ম্যাক্সিমাম হয়, আবার কমতে থাকে।

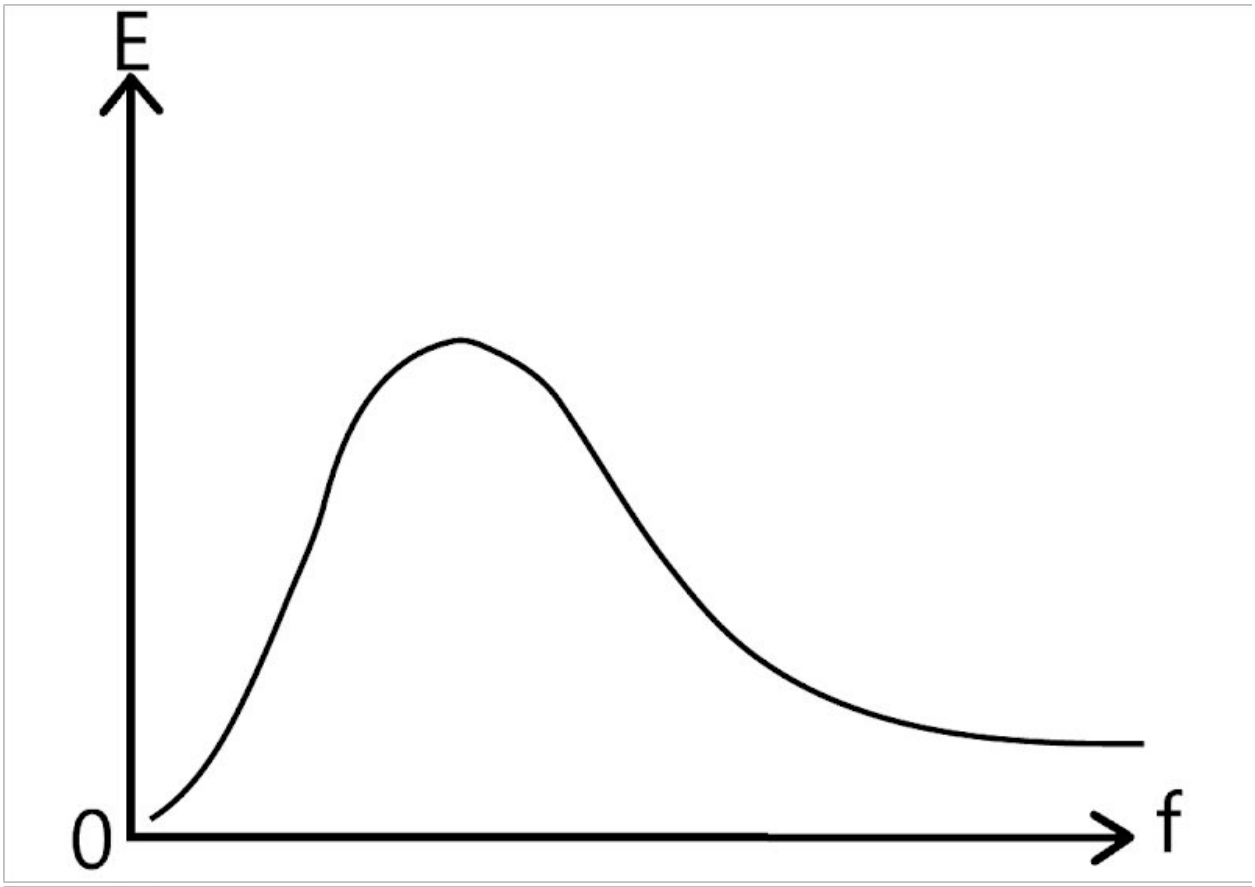

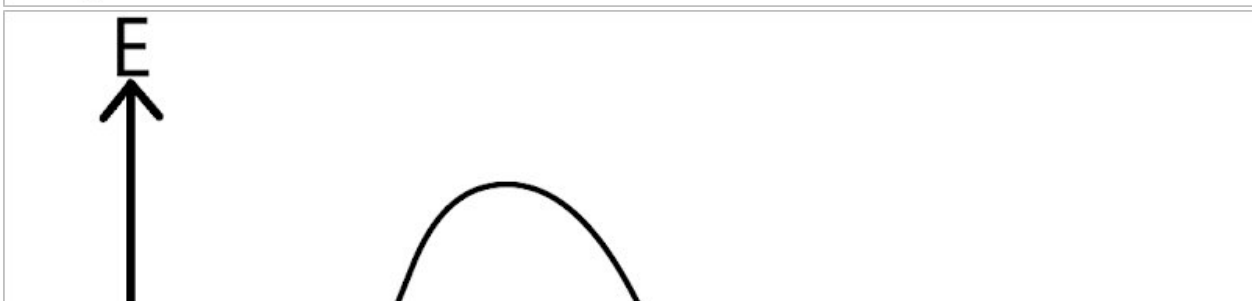

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

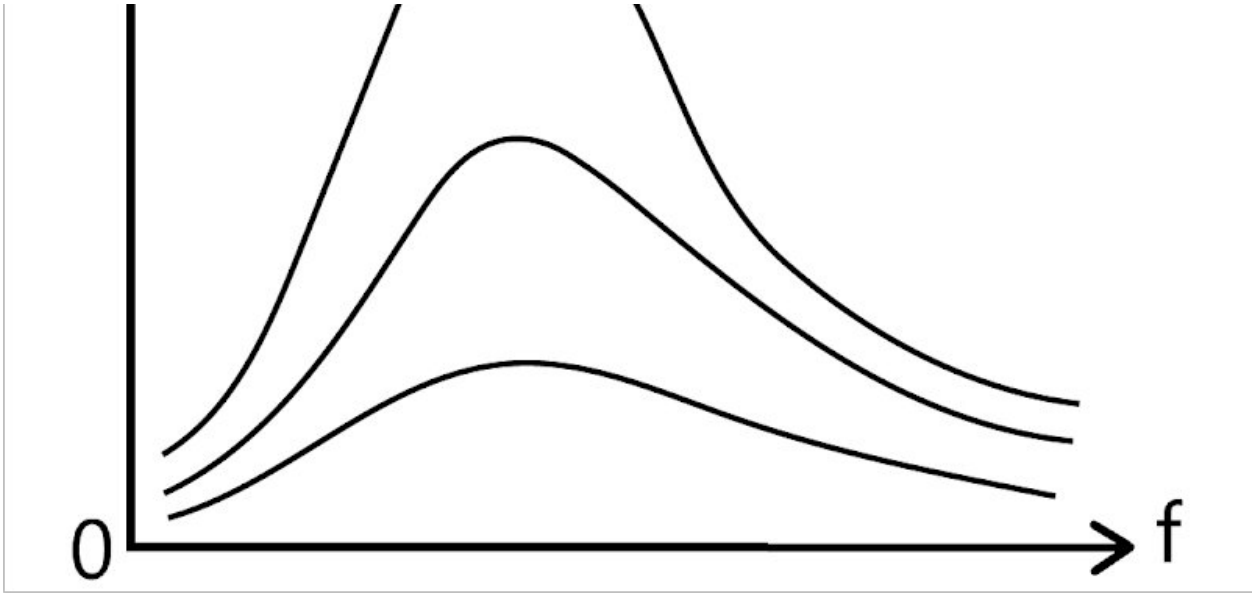

তাপমাত্রা বাড়ালে ওই ম্যাক্সিমামটার মান আরো বাড়ে, হয়তো আরো বেশি কম্পাঙ্কের জন্য শক্তি ম্যাক্সিমাম হয়, কিন্তু একটু পর কমতে থাকে। ঠিক যেন, কোন এক আশ্চর্য কারণে, তুমি ১০০ টাকার নোটে মোট যত টাকা নিতে পারছ, ৫০০ টাকার নোটে সেটা পারছ না।
কি হতে কারণটা?

একটু ভাবো।
বাঁচতে হলে ভাবতে হবে।

ভাবা শেষ?
চলো আক্কাস আলীর গল্প শুনে আসি।

২।
আলুর ব্যাপারি আক্কাস আলীর বিশাল আলুর আড়ত। আড়তের সিকিউরিটি সেই লেভেলের কড়া।
আক্কাস আলী দুই ফুট পুরু টাইটেনিয়ামের দেয়াল দিয়েছেন। আড়তের চাশপাশে কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক নিয়ে সব সময় সেনাবাহিনী বসে থাকে। আকাশে উড়ে উড়ে গার্ড দিচ্ছে লেযার ওয়ালা ড্রোন।

সব মিলিয়ে আক্কাস আলীর আলুর আড়ত ঝাক্কাস চলছিল। ঝামেলা বাধালো নতুন এক চোর। এই চোর মোটামুটি আন্সটপেবল, কোন কিছুতেই তাকে ঠেকানো যায় না। কামান বন্দুক টাইটেনিয়ামের দেয়াল সব এড়িয়ে চোর কেমন করে জানি আলু নিয়ে যায়।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

আক্কাস আলীর যখন টেনশনে অস্থির অবস্থা, বক্কর ভাই তখন অস্থির এক আইডিয়া দিলেন তাকে। (আলুর ব্যাপারির সাথে পার্টনারশিপে লাভ আছে, তাছাড়া আড়তে ঢুকতে পারলে চোরের টেকনোলজিটা ভালো করে ঘুতিয়ে দেখা যাবে)। আইডিয়া এত সিম্পল যে আক্কাস আলীর আবেগে চোখে পানি চলে আসলো।

বক্কর ভাই বললেন, আলুকে বস্তায় ভরাতে হবে। শক্ত শক্ত বস্তা, চোর যাতে ছিড়তে না পারে এরকম। প্রথমে ছোট বস্তা নিয়ে ট্রাই করতে হবে। আস্তে আস্তে বস্তার সাইজ বাড়াতে হবে। একসময় দেখা যাবে বস্তা এত বড় হয়ে গেছে যে চোর আর একটা বস্তাও তুলতে পারছে না। হাজার হোক, চোরও তো মানুষ, সে কি আর ম্যাজিক জানে?
আক্কাস আলী কথামত কাজ করলেন। ঠিকই, আলুর বস্তা বড় হওয়ার সাথে সাথে আস্তে আস্তে চোরের চুরি করা কমতে থাকলো। ছোট বস্তা সে একাই দুই তিনটা তুলতে পারে, কিন্তু বস্তা বড় হলেই খবর হয়ে যায়। শেষে ৫০ কেজির আলুর বস্তা তুলতে যেয়ে চোরের মাজা ভেংগে গেল। চুরি করার সাধ পার্মানেন্টলি মিটলো।

যে চোর দুই ফুট পুরু টাইটেনিয়ামের দেওয়াল ভেদ করতে পারে সে বস্তার ভেতর ঢুকে কেন আলু বের করতে পারলো না, এই চিন্তা দুই একবার মাথায় এসেছিল আক্কাস আলীর, কিন্তু চিন্তা করে খুব একটা লাভ হলো না।
তিনি আলুর ব্যাপারী। টেকনোলজি তাঁর খুব একটা মাথায় ঢুকে না। সেগুলো বক্কর ভাইয়ের ব্যাপার। আলু চুরি বন্ধ হয়েছে, এতেই তিনি খুশি।

বক্কর ভাই এই মুহূর্তে বিশাল চিন্তায় মগ্ন। কি জানি একটা সন্দেহ ঢুকেছে তাঁর মাথায়। এখন তাঁর সাথে কথা বলা যাচ্ছে না।

৩।
ম্যাক্স প্লাঙ্কের মুখটা একশো ওয়াট বাল্বের মত জ্বলে উঠলো। সমাধান পাওয়া গেছে।

আলুর যেমন প্যাকেট আছে, আলোরও তেমন প্যাকেট আছে। কম্পাঙ্ক যত বেশি, ওই প্যাকেট তত বড় সাইজের। তত বড় শক্তি। বড় প্যাকেট তৈরি হতে অনেক বেশি শক্তি লাগে, তাই বড় প্যাকেট হয় খুব কম। একসময় হয়তো একটা প্যাকেট বানানোর মত শক্তিও পাওয়া যায় না, তখন প্যাকেট বানানো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে।
কোন একটা কম্পাঙ্কের মোট শক্তি হবে তাহলে ওই কম্পাঙ্কের প্যাকেটগুলোর শক্তির যোগফল।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

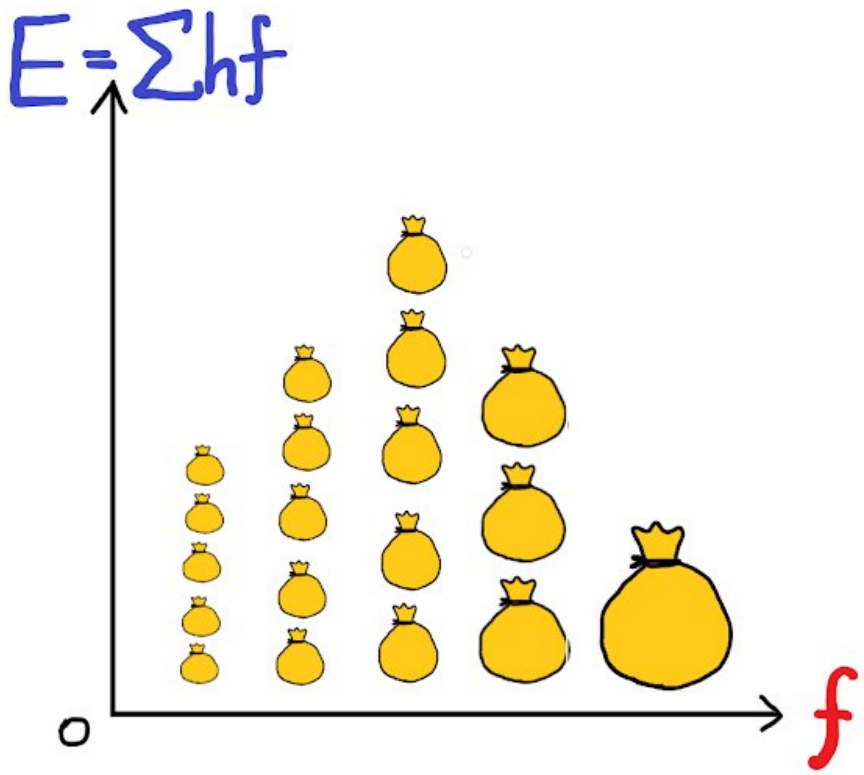

ধরি, কম্পাঙ্ক একের জন্য মোট প্যাকেট হয় পাচটা, মোট শক্তি ৫ * ১ * ধ্রুবক।
কম্পাঙ্ক দুইয়ের মোট শক্তি ৫ * ২ * ধ্রুবক।
তিনের জন্য ৫ * ৩ * ধ্রুবক।
চারে যেয়ে ঝামেলাটা হয়। পাঁচটা প্যাকেট তৈরি হওয়ার শক্তি পাওয়া যায় না। তৈরি হয় তিনটা প্যাকেট। মোট শক্তি ৩ * ৪ * ধ্রুবক।
কম্পাঙ্ক পাঁচ হলে প্যাকেট হয় মোটে একটা। শক্তি ১ * ৫ * ধ্রুবক।
এরপর আর একটা প্যাকেট হওয়ার মতো শক্তিও পাওয়া যায় না।

প্ল্যাঙ্ক ভাবলেন, কৃষ্ণবস্তুতে আছে হাজার হাজার ছোট ছোট জিনিস। সেই জিনিসগুলো অণবরত কেপে কেপে আলোর প্যাকেট ভরছে। প্যাকেটে প্যাকেটে আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। প্লাঙ্ক হিসাব করে বের করলেন কোন কম্পাঙ্কের প্যাকেট কয়টা হতে পারে। তার গুরু বোল্টজম্যানের সূত্র নিয়ে ঘাটাঘাটি করে জটিল এক সমীকরণ লিখলেন। নাম দিলেন প্ল্যাঙ্কের সূত্র।

আমরা ওই জটিল সূত্রের দিকে যাবো না। আমাদের আগ্রহ এক লাইনের ছোট্ট একটা সমীকরণে।
ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক হয়তো সেটা খাতার এক কোণায় লিখে রেখেছিলেন। যে ধ্রুবকটা তিনি ব্যবহার করেছিলেন সেটা জার্মান ভাষায় তার নাম হচ্ছে hilfsgrosse, মানে হচ্ছে সাহায্যকারী ধ্রুবক। কোন জটিল গ্রিক অক্ষর না লিখে এক কথায় তিনি এর নাম দেন h.

একটা আলোর প্যাকেটের শক্তি হচ্ছে

$$E = hf$$

h হচ্ছে প্ল্যাংকের ধ্রুবক। এর মান $6.62607015[?][?]10^{-34}$ জুল সেকেন্ড। ফিজিক্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা ধ্রুবকের নাম বললে একটা হবে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক।

সেদিনের সামান্য এক সাহায্যকারী ধ্রুবক এখন মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় অমিমাংশিত রহস্যগুলোর একটা।

৪।
ভোর হয়েছে।
প্ল্যাঙ্ক জানালা খুলে দিলেন। প্যাকেট প্যাকেট আলো এসে প্ল্যাঙ্কের চোখে মুখে লাগলো। তার সাদা চামড়া ভোরের নরম আলোয় লাল হয়ে গেল।

প্ল্যাঙ্ক কি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন কত বড় একটা আবিষ্কার তিনি করে ফেলেছেন? তিনশো বছর আগে চাপা পড়ে থাকা নিউটনের আলোর কণাকে তিনি কবর থেকে টেনে তুলেছেন?
তার মনে কি একবারো এসেছিলো আলো একই সাথে কণা আর তরংগ, এই জিনিসের মানে কতটা ভয়াবহ হতে পারে?

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক আদর করে আলোর প্যাকেটের নাম দিলেন কোয়ান্টা। জন্ম হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

ফাউন্ডিং ফাদারস

১।
বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরে সাজ সাজ রব, আজকে এক বিশেষ অতিথি আসছেন তাদের দেশে। তিনি নাকি সাড়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী, ফিজিক্সের আইন কানুনকে একেবারে উলটে ফেলেছেন। তাঁর নাম শুনলে সসম্ভ্রমে উঠে দাড়ান পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীরা।

বেলজিয়ামের রাণী একদল অফিশিয়াল পাঠিয়েছেন বিজ্ঞানীকে স্বাগত জানাতে, তিনি ট্রেইন থেকে নামলেই তাকে সসম্মানে গাড়িতে করে নিয়ে আসা হবে। হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে তারা অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন স্টেশনে।

কিন্তু ঝাকড়া চুলের ছেড়াফাটা কাপড় পড়া যে মানুষটা ট্রেইন থেকে নামলেন তাকে দেখে কারো মাথায় একবারও আসলো না এই মানুষটাই আসলে জগত-বিখ্যাত বিজ্ঞানী। মজার ব্যাপার হলো, বিজ্ঞানীরও মাথায় আসলো না তাকে নেওয়ার জন্য কেউ লোক পাঠাতে পারে।

রানীর লোকজন দাড়িয়ে থাকলো স্টেশনে। বিজ্ঞানী নেমে পড়লেন রাস্তায়। বের করলেন তার ভায়োলিন।

স্টেশন থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত পুরাটা পথ বিজ্ঞানী হাটতে হাটতে গেলেন। ব্রাসেলসের মানুষজন মুগ্ধ হয়ে শুনল তার অসাধারণ সম্মোহনী বাজনা! কেউ জানতেও পারলো না অতি সাধারণ কাপড় পড়া এই বেহালা বাদক পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন।

আলবার্ট আইনস্টাইন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একজন জনক।
তাঁর জন্য সম্মান আর ভালবাসা।

২।
পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলো, ব্যারোমিটারের সাহায্যে বিল্ডিং এর উচ্চতা মাপতে হবে। ঘারতেরা ছাত্রের উত্তর, ব্যারোমিটারটাকে সুতায় বেঁধে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক, তারপর সুতা আর ব্যারোমিটারের দৈর্ঘ্য মাপলেই বের হয়ে আসবে বিল্ডিঙের দৈর্ঘ্য।

এই উত্তর দেখে টিচারের মেজাজ মারাত্মক খারাপ হয়ে গেল। ঘারতেরা ছাত্রকে ফেল করানো হোল।

ছাত্রও কম যায় না। সে টিচারের নামে আপিল করে বসলো। উত্তর তো ঠিক আছে, সে জানতে চায় ঠিক কি কারনে তাকে ফেল করানো হলো।

ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিন মহা ফ্যাসাদে পড়ল। একজন নিরপেক্ষ জাজ ঠিক করলো ছাত্র আসলেই পাশ করার যোগ্য নাকি যাচাই করার জন্য।

জাজ বলল, উত্তর ঠিক আছে, কিন্তু এতো বছরের ফিজিক্স শিক্ষা কোন কাজে লেগেছে নাকি সব মাথার উপর দিয়ে গেছে এই উত্তর

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। ছাত্রকে ৬ মিনিট সময় দেওয়া হোক, সে প্রমাণ করুক আসলেই কিছু বুঝেছে।

১ মিনিট গেল। ২ মিনিট গেল। ছাত্র ভাবছে তো ভাবছেই, উত্তর নেই। শেষে ১ মিনিট বাকি থাকতে জাজ বলল, ছেলে তোমার কি আসলেই কিছু বলার আছে নাকি ফেল করায় দিবো?

ছাত্র বলল, আসলে তো ব্যারোমিটারের সাহায্যে বিল্ডিঙের উচ্চতা মাপার শত শত উপায় আছে, কি উত্তর দিবো সেটাই ভাবছিলাম।

মানে?

মানে হচ্ছে ধরেন ব্যারোমিটারটাকে ছাদে নিয়ে আছাড় মারা যায়। পড়তে কতক্ষণ লাগে দেখে বের করা যাবে বিল্ডিং এর উচ্চতা।

আপনার গণিত ভালো লাগলে ব্যারোমিটারটাকে মাটিতে বসিয়ে, প্রথমে ব্যারোমিটার আর তার ছায়ার অনুপাত মাপবেন, তারপর মাপবে বিল্ডিং এর ছায়া, ওইখান থেকে বের হয়ে যাবে বিল্ডিং এর উচ্চতা।

নিজেকে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী মনে হয়? ব্যারোমিটারটাকে মাটিতে নিয়ে সুতায় বেধে একবার সরল দোলকের মতো দুলান। তারপর ছাদে নিয়ে দুলান। দোলন কালের পার্থক্য থেকে বের হয়ে যাবে উচ্চতা।

...
...

কিন্তু একেবারেই যদি বোরিং, ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে চিন্তা করতে হয়, তাহলে আর কি! ব্যারোমিটার একবার মাটিতে নিয়ে বাতাসের চাপ মাপবেন, একবার মাপবেন ছাদে নিয়ে, তারপর দুই চাপের পার্থক্য থেকে বের হয়ে যাবে উচ্চতা।

এই ঘারত্যারা ছাত্রের নাম ছিল নীলস বোর। অসম্ভব ক্রিয়েটিভ মানুষ। আইনস্টাইনের সাথে সামনাসামনি বিজ্ঞান নিয়ে বিতর্ক করার শক্তি খুবই কম মানুষের ছিল, বোর ছিলেন এমন একজন যিনি একবার না, বারবার আইনস্টাইনকে হারিয়েছেন। তিনি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জনকদের একজন।

নীলস হেনরিক ডেভিড বোরের জন্য সম্মান আর ভালবাসা।

৩।
ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডিতে থাকত অতি সম্ভ্রান্ত ব্রগলি পরিবার। পরিবারে ছিল নাম করা সব রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সৈনিক। তাদের প্রতাপে পুরো শহর কাঁপত। বিজ্ঞানকে অপছন্দ করতে হবে, অবজ্ঞা করতে হবে, এই ছিল পরিবারের নীতি। এই পরিবারের প্রথম কুসন্তান ছিলেন মরিস ডি ব্রগলি। নিজের ডিউক উপাধির তোয়াক্কা না করে ফ্যামিলি ম্যানশনে ল্যাবোরেটরি খুলে বসলেন। শুরু করলেন নিউক্লিয়াস নিয়ে গবেষণা।

মরিস ছিলেন লুইয়ের চেয়ে ১৭ বছরের বড়। ছোট ভাই লুই মরিসকে দেখে দেখে বড় হন। মরিসের ল্যাবে হাবিজাবি যন্ত্রপাতির আড়ালে ঘুমিয়ে আছে অদ্ভুত সুন্দর এক অজানা জগৎ। লুই সেগুলো দেখতেন আর ভাবতেন। পরীক্ষা করার চেয়ে তার ভাল লাগত চিন্তা করতে। কিন্তু পরিবারের চাপে তিনি বাধ্য হন ইতিহাস নিয়ে পড়তে। সামনে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে উজ্জ্বল ডিপ্লোম্যাটিক ক্যারিয়ার।

তারপর একদিন দেশে যুদ্ধের দামামা বাজলো, গোলা বারুদের তীব্র শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। পরিবারের মান রাখতে লুই যুদ্ধে গেলেন। রেডিও ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকল মরিসের ল্যাবে ঘুমিয়ে থাকা ওই গোপন রহস্যময় জগতে।

যুদ্ধ শেষ হলো। লুই বাড়ি ফিরলেন। তিনি এখন বাড়ির ছোট ছেলে না, শক্ত-পোক্ত এক যোদ্ধা। অনেক হয়েছে এসব, আর না।

লুই জোর গলায় ঘোষণা করলেন, ফিজিসিস্ট হবেন। ইতিহাস বাদ। পলিটিক্স বাদ। এসবের জন্য তাঁর জন্ম হয় নি।

লুই ডি ব্রগলি যেদিন প্রমাণ করলেন ইলেকট্রন একই সাথে কণা আর তরঙ্গ, সেদিন থেকেই সত্যিকারের কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জন্ম হলো। তাই তিনি কোয়ান্টাম থিওরির একজন জনক।
ফ্রান্সের সৈনিক, নোবেল বিজয়ী ফিজিসিস্ট, ডিউক লুই ভিক্টর পিয়েরে ডি ব্রগলির জন্য অনেক সম্মান আর ভালোবাসা।

৪।
মাত্র ৪ বছর জেনারেল রিলেটিভিটি বের হয়েছে। এর মধ্যে ১৯ বছরের ১টা ছেলে জেনারেল রিলেটিভিটির উপর পেপার পাবলিশ করে ফেলেছে। ২০ বছর বয়সে তাকে দেওয়া হয়েছে গনিতের এনসাইক্লোপিডিয়া লেখার কাজ। এই ছেলের নাম উলফগ্যাং পলি। ৪র্থ কোয়ান্টাম সংখ্যা আর অপবর্জন নীতি তাকে অমর করে রেখেছে।

২১ বছর বয়সে বিখ্যাত প্রফেসর ম্যাক্স বর্নের অ্যাসিস্ট্যান্ট হন পলি। তারপর তাকে ছেড়ে রওনা দেন বোরের ইন্সটিটিউটে। ম্যাক্স বর্ন তাকে হারিয়ে খুব যে কষ্ট পেয়েছেন বলা যাবে না, কারন ততদিনে পলির প্রায় সমবয়সী, একি রকম মেধাবী আর একজন যোগ দিয়েছে তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে।

ম্যাক্স বর্নের এই নতুন অ্যাসিস্ট্যান্টের নাম ভার্নার হাইজেনবার্গ। তাঁর গল্প পরে অনেকবার বলা হবে জন্য আজকের মতো রেখে

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

দিলাম।

পলি, বর্ন আর হাইজেনবার্গ কোয়ান্টাম থিওরির তিনজন জনক।
তাদের জন্য সম্মান আর ভালবাসা।

৫।
হাইজেনবার্গের চেয়ে মাত্র কয়েক মাসের ছোট পল ডিরাক। ২১ বছর বয়সে ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেন, চাকরি পাননি। ২৫ বছরের ডিরাক গণিত নিয়ে পড়ছেন। সমবয়সী হাইজেনবার্গ তখন নাম করা বিজ্ঞানী, তাঁর লেকচার শুনতে ভিড় করে আসে মানুষ। একদিন ডিরাকের কাছে তাঁর টিচার ফাউলার হাইজেনবার্গের একটা পেপার ধরিয়ে দিলেন। হয়ত বললেন, প্রফেসর হাইজেনবার্গের পেপার, দেখ তো কিছু বুঝো নাকি?

পল অ্যাড্রিয়েন মরিস ডিরাক পেপারটা হাতে নিলেন। পড়লেন। খুব বেশি নতুন কিছু পেলেন না। এগুলো তো আমি এমনিই জানি, এরকম একটা ব্যাপার।

...

পাঁচ বছর পরের কথা। ত্রিশ বছরের পল ডিরাককে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হবে। ইতিহাসে তখন পর্যন্ত এত কম বয়সী কেউ নোবেল পায় নি। পল ডিরাক ইতিহাস গড়তে চলেছেন।
সমস্যা হচ্ছে, ডিরাক নোবেল প্রাইজ নিতে চাচ্ছেন না।। একা বসে অংক করতে তাঁর ভালো লাগে। নোবেল প্রাইজ নিলে তিনি বিখ্যাত হয়ে যাবে। তিনি বিখ্যাত হতে চান না।
বন্ধুরা ডিরাককে বুঝালো, দেখো, নোবেল প্রাইজ আজ পর্জন্ত কেউ রিজেক্ট করে নি। তুমি রিজেক্ট করলে আরো বেশি বিখ্যাত হয়ে যাবা। সেটা কি তুমি চাও?
পল ডিরাক নোবেল নিতে রাজি হলেন। নোবেল কমিটি হাঁফ ছেড়ে বাচলো।

কোয়ান্টাম থিওরি অনেক মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা, কিন্তু ওই থিওরির পেছনে যদি দুইজন মানুষের নাম মার্ক করে বলতে হয়, একজন হবে পল ডিরাক। ডিরাক কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির জনক। আন্টিম্যাটারের জনক। ডিরাক ইকুয়েশনের জনক। ফার্মি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিকসের অন্যতম জনক। তাকে বলা হয় নিউটনের পর প্রথম ব্রিটিশ বিজ্ঞানী যিনি নিউটনের সমকক্ষ হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

পল ডিরাকের প্রতি সম্মান আর ভালবাসা।

৬।
১৯২৪ সাল। ঢাকা ভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞানের এক লেকচারার তাঁর ছাত্রদের বোঝানর চেষ্টা করছেন কিভাবে প্ল্যাঙ্কের থিওরি পরিপূর্ণ না, কিভাবে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ থিওরির কোন রকম সাহায্য ছারা E=hf কে ব্যাখ্যা করা যায়। ৩০ বছরের লেকচারারের ওই ব্যাখ্যা তাঁর ছাত্রদের মাথার উপর দিয়ে গিয়েছিল কিনা জানি না, আইনস্টাইন কিন্তু বুঝেছিলেন।

আইনস্টাইন নিজে তাঁর পেপার জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে পাবলিশ করার ব্যাবস্থা করেন। আর কিছু ইম্প্রুভমেন্টের পর ওই পেপারর নাম হয় বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স।

অবহেলিত এই বাঙ্গালি বিজ্ঞানীর নাম সত্যেন বোস। তিনি কোয়ান্টামের আর এক জনক।
তাঁর জন্য অনেক সম্মান আর ভালোবাসা।

৭।
পল ডিরাকের সাথে নোবেল শেয়ার করেন মাঝবয়সী এক অস্ট্রিয়ান প্রফেসর। চোখে তাঁর গোল গোল চশমা, চশমার ওপাশে অতি কৌতূহলী দুটা চোখে তাঁর ক্ষুধা চিকচিক করছে। তিনি বহুমাত্রিক মানুষ। জীবনকে যতভাবে সম্ভব উপভোগ করে চলেছেন। তাঁকে সম্মানি দেওয়ার জন্য অস্ট্রিয়ান সরকার তাদের ব্যাঙ্ক নোটে তাঁর ছবি ছাপিয়েছিলো।
কিছু কিছু দেশের সরকার তাদের সেরা বিজ্ঞানীদের ছবি তাদের ব্যাঙ্ক নোটে ছাপিয়ে রাখে।

কোয়ান্টাম থিওরির পেছনে যে দুইজন মানুষের অবদান সবচেয়ে বেশি তাদের একজন হচ্ছেন এই প্রফেসর। আজ তাঁর নাম বলব না। অজ্ঞাতনামা প্রফেসরের জন্য অনেক সম্মান আর ভালবাসা।

৮।
আমরা সম্মানের অযোগ্য ব্যাক্তিদের সম্মান দিয়ে অভ্যস্ত। স্বার্থ হাসিলের জন্য যাকে খুশি তেল দিয়ে আসছি।

এই মানুষগুলো আধুনিক জীবনের জনক। মোবাইল কম্পিউটার ইন্টারনেট ইলেক্ট্রনিক্স সবকিছু এই কোয়ান্টাম থিওরির অবদান। এই মানুষগুলো কোয়ান্টাম থিওরির জনক।

এদের সম্মান দেওয়ার কথা কোনদিন ভেবেছি কি?

৯।
আজ পহেলা জানুয়ারি। সত্যেন বোসের জন্মদিন।

শুভ জন্মদিন, স্যার!

পরমাণুর গল্পঃ প্রথম যুগ

"All science is either physics or stamp collecting."
-Ernest Rutherford

আইন্সটাইনের অ্যাটম, টমসনের পুডিং

১।
পরমাণুর কথা অনেক অনেক আগে থেকেই চালু ছিল। ডেমোক্রিটাস বলেছেন, ডাল্টন বলেছেন, বলেছেন ভারতীয় বিজ্ঞানী কণাদ। এদের ভিড়ে কিন্তু আমরা ভুলে যাই সেই লোকটার কথা, যিনি প্রথম নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন পরমাণু আসলেই আছে।
অন্য কেউ এই কাজ করলে তাকে নোবেল দেওয়া যেত, কিন্তু এই লোক তাঁর জীবনে ৫-৬টা নোবেল পাওয়ার মত কাজ করেছেন, তাঁর কাজ বুঝে তাকে নোবেল দেওয়ার যোগ্যতা নোবেল কমিটির ছিল না।

১৯০৫ সালে, আইনস্টাইন তাঁর ২৬ বছর বয়সে, সুইজারল্যান্ডের প্যাটেন্ট অফিসে বিরক্তিকর কেরানির চাকরি করতে করতে ৩টা পেপার লিখেন। একটা থেকে জন্ম হয় ফোটনের, আরেকটা থেকে স্পেশাল রিলেটিভিটির, আরেকটা পেপার নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে পরমাণু আসলেই আছে, এটা শুধু একটা ধারনা না। বাকি দুইটা পেপারের কথাও এই বইয়ে আস্তে আস্তে বলব, আজকে বলি কেবল তিন নাম্বারটার কথা।

আইন্সটাইন কিভাবে বুঝলেন পরমাণু আসলেই আছে?

বাতাসে ঘুরাঘুরি করে অনেক ধুলার কণা। পানিতে ছোটাছুটি করে অনেক ছোট ছোট কণা, মাটির কণা, গাছের পরাগ রেণু, হাজারো জীবিত আর মৃত জিনিস। এই ছোটাছুটিকে বলে ব্রাউনিয়ান মোশোন। আমরা ছোটবেলা থেকে এই ছোটাছুটি দেখে বড় হয়ছি, কোনদিন ভালভাবে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করি নি। আইনস্টাইন করেছিলেন।

তিনি প্রথম দেখান কিভাবে পানিতে ভাসমান পোলেন কণাগুলোকে চারদিক থেকে পানির কণাগুলো ধাক্কা দেয়, তাই তারা একবার এদিক আরেকবার অন্যদিকে যায়। আইনস্টাইন হিসাব করে বের করেন কত ধানে কত চাল, কত ধাক্কায় কত বেগ, কি পরিমাণ ধাক্কা হলে পোলেন কণা কোন দিকে কতবেগে যাবে। সেখান থেকে আইনস্টাইন দেখান, পানি, বাতাস এগুলো সব আসলে ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরি, অণু-পরমানু আসলে হাইপথেটিক্যাল না, রিয়েল জিনিস। শুধু তাই না, আইনস্টাইন সূত্র বের করেন, কিভাবে এই অনু-পরমানুর সাইজ বের করা যায়!

আইনস্টাইন থিওরিটিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানী। ল্যাব তাকে টানে নি। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন বলে দেন কিভাবে অ্যাটমের সাইজ বের করতে হয়, জন পেরিন ১৯০৮ সালে আইনস্টাইনের থিওরি ব্যাবহার করে বের করেন, ১ মোল পানিতে প্রায় 6.02×10^{23} টা কণা থাকে।
এই সংখ্যাটাকে আইনস্টাইন নাম্বার বলা যেত, পেরিন নাম্বারও বলা যেত, কিন্তু সংখ্যাটার নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাভোগেড্রো নাম্বার। এই কাজের জন্য পেরিন ১৯২৬ সালে নোবেল প্রাইজ পান।

আইনস্টাইন নোবেল পান নি। স্পেশাল রিলেটিভিটি, জেনারেল রিলেটিভিটি, কোন কিছুর জন্যই তিনি নোবেল পাননি। শুধু ফটোইলেক্ট্রিক ইফেক্ট ব্যাখ্যার জন্য একবার নোবেল পেয়েছেন।
আমি তাকে নোবেল প্রাইজের অনেক উপরে মনে করি।

২।
জে জে টমসন।
থমসন নয়, উচ্চারণ আসলে টমসন।
ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর।
১৮৯৭ সালে, আইনস্টাইন পরমাণুর প্রমাণ দেওয়ারও ৮ বছর আগে এই ভদ্রলোক ইলেকট্রন আবিষ্কার করে বসেন!
টমসন পরমাণুর ভর জানতেন না, ইলেকট্রনের ভরও জানতেন না, কিন্তু তিনি জানতেন কিভাবে একটা জানা মানের ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্য দিয়ে জানা বেগের ক্যাথোড রে মারলে ক্যাথোড রের কণাগুলোর ভর আর চার্জের অনুপাত বের করা যায়। ভর জানলে চার্জ জানবো, চার্জ জানলে ভর। মিলিক্যান আর ফ্লেচার, তাদের বিখ্যাত অয়েল ড্রপ এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে হিসাব করে বের করেন ইলেকট্রনের চার্জ, তারপর টমসনের সূত্রের সাহায্যে বের করেন ইলেকট্রনের ভর!
১৯০৪ সাল। আমরা পরমাণুর সত্যিকারের অস্তিত্ব জানি না, কিন্তু আমরা ইলেকট্রনের ভর পর্জন্ত জানি!

টমসন ধারনা করলেন পরমাণুর ভর, ইলেকট্রনের ভরের অন্তত ১০০০ গুন। ১৯০৪ সালে পরমাণুকে রিয়েল ধরে টমসন প্রথন পরমাণুর মডেল বের করেন।
তাঁর মডেলে পরমাণু একটা পুডিং এর মতো। প্লামের পুডিং। প্লাম কেন জানি না, টমসন বাঙ্গালি হলে হতো প্লামের পুডিং বদলে আমের আমসত্ব হয়ে যেত।
এই পুডিং খুব পজিটিভ একটা জিনিস, খুবই টেস্টি।
শুধু মাঝখানে প্লানের বিচির মত ঘুরাঘুরি করছে কিছু নেগেটিভ মেন্টালিটির ইলেকট্রন।

জে জে টমসন ১৯০৮ সালে নোবেল প্রাইজ পান, ইলেকট্রন একটা কণা প্রমাণ করার জন্য। তাঁর ছেলে প্যাজেট টমসন, ১৯৩৭ সালে নোবেল প্রাইজ পান প্রমাণ করার জন্য যে, ইলেকট্রন আসলে একটা তরঙ্গ! মিলিক্যান নোবেল পান ১৯২৩ সালে।

৩।
টমসনের গল্প শেষ। আইনস্টাইনও আপাতত বিদায় নিবেন।
নাটকের পরের দৃশ্যে মঞ্চে আসবেন আরনেস্ট ব্যারন রাদারফোর্ড।

রাদারফোর্ডের আগমন

১।
পরমাণু খুবই ছোট।
এক চামচ কয়লাতে থাকে থাকে 6.02×10^{23} টার মতো পরমাণু। খুবই খুবই বিশাল সংখ্যা।

এই মহাবিশ্বের বয়স তেরশো আশী কোটি বছর। 13.8×10^{9} বছর। এক বছরে আছে ৩২ মিলিয়ন সেকেন্ড। এই তেরশ কোটি বছরে সেকেন্ডের কাটাটা টিক দিয়েছে প্রায় 4.3×10^{17} বার।

ধরো তোমার জন্ম বিগ ব্যাঙের সময়। তোমার একমাত্র কাজ একটা একটা করে কার্বন পরমাণু ওই এক চামচ কয়লা থেকে সরানো। তুমি তেরশ আশি কোটি বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত, প্রতি সেকেন্ডে একটা করে পরমাণু সরাচ্ছো। তোমার ঘুম নেই, খাওয়া নেই, প্রতি সেকেন্ডে একটা করে পরমাণু সরিয়ে যাচ্ছ। এতো কিছু করেও, তুমি একটা ধূলির কণা পরিমাণ পরমাণুও এত বছরে সরাতে পারবে না। একটা ধূলির কণা পরিমাণ পরমাণু সরাতে তোমাকে খাটতে হবে ১০০০০ বিগ ব্যাং পরিমাণ সময়।

এই অতি ক্ষুদ্র অতি রহস্যময় পরমাণুকে কোন আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না। ১৯৮১ সালে প্রথম স্ক্যানিং টানেলিং ইলেকট্রন মাইস্ক্রোপ বের হয়, এই যন্ত্র দিয়ে পরমাণুর ছবি তুলা যায়, আলো নয়, ইলেকট্রনের সাহায্যে। ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে যারা প্রথম পরমাণুর মডেল তৈরি করেছেন তারা কোনোদিন পরমাণু দেখেন নি।
এই তুখোড় বুদ্ধিমান মানুষগুলো সম্পূর্ণ না দেখে, শুধু কতগুলো ইন্ডিরেক্ট পরীক্ষা করে সেই যুগে পরমাণুর মডেল বের করেছেন। তাদের আমি সালাম জানাই।

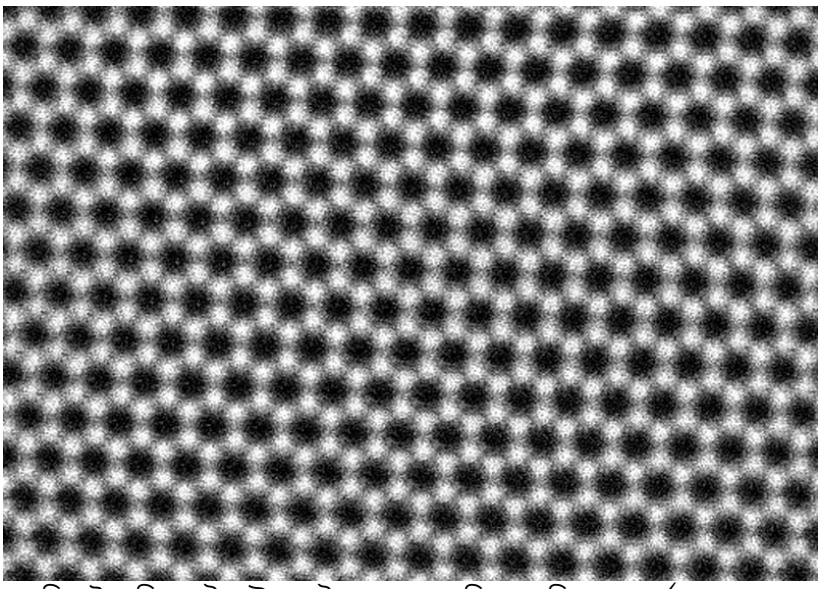
স্ক্যানিং ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে গ্রাফিনের কার্বন পরমাণু

পর্দা সরে গেছে। মঞ্চে আসছেন আর্নেস্ট ব্যারন রাদার্ফোর্ড অভ নেলসন। লর্ড রাদার্ফোর্ডের জন্য আমরা সবাই একটু উঠে দাড়াই!

২।
লর্ড রাদারফোর্ড ছিলেন খাঁটি পদার্থবিজ্ঞানি। তাঁর মতে, শুধু ফিজিক্সই হলো বিজ্ঞান, বাকি সব স্ট্যাম্প কালেকশন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, রাদারফোর্ড কয়েকদিন আগে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, ফিজিক্সে নয়, কেমিস্ট্রিতে। নোবেল পেয়েও তাঁর মন খুব একটা ভালো নেই।

তবে এই মুহুর্তে রাদারফোর্ড খুব খুশি। টমসনের পরমাণু মডেলে একটা বিরাট বড় ভুল আছে, তিনি সেটা ধরতে পেরেছেন।

টমসন বলেছিলেন, পরমাণু পুডিং এর মতো। মাঝখানে কিছমিছের মতো ইলেকট্রন বসানো থাকে। রাদারফোর্ড কয়েকদিন আগে খুব পাতলা সোনার পাতের মধ্যে আলফা কণা ছুড়ে মেরেছেন। পরমাণু পুডিঙের মতো হলে সব আলফা কণা সমানভাবে সোনার পাত পার করে যেত। সেটা হয় নি। বেশিরভাগ কণা পার করে গেছে, খুব অল্প কিছু কণা ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে।

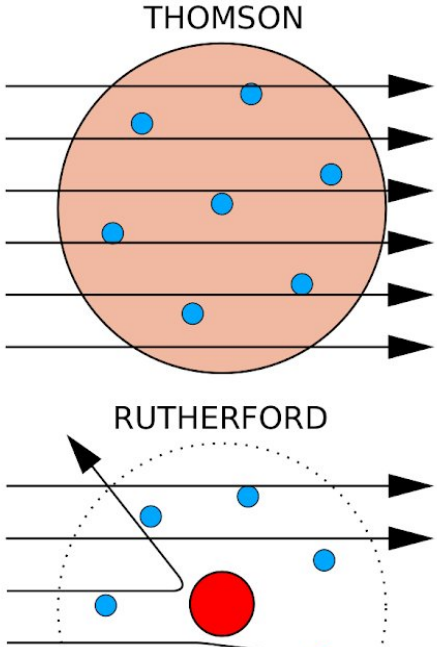

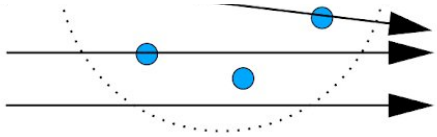

রাদারফোর্ড ভাবছেন। তাঁর চোখে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে।
বেশিরভাগ কণা পাড় করে গেছে মানে, পরমাণু আসলে ফাঁকা।
খুব অল্প কিছু কণা ধাক্কা খেয়েছে, তারমানে পরমাণুর পুরো ভরটা খুব অল্প জায়গায় থাকে। টমসন অলরেডি জানিয়েছেন, ইলেকট্রনের ভর মোট ভরের তুলনায় খুবই অল্প।
ওই অল্প জায়গায় জড়ো হয়ে থাকা ভরটা তাহলে পজিটিভ জিনিসটার ভর।
ভারি জিনিস সবসময় কেন্দ্রে থাকবে। রাদারফোর্ড এর নাম দিলেন নিউক্লিয়াস।

কেন্দ্রে যদি একটা ভারি নিউক্লিয়াস থাকে, ইলেকট্রনকে অবশ্যই বাইরে থাকতে হবে। ইলেকট্রন চুপ করে বসে থাকলে কি হবে? নিউক্লিয়াস তাকে টেনে নামিয়ে ফেলবে। আর ইলেকট্রন যদি উলটা দিকে রওনা দেয়? তাহলে তো পরমাণুতে ইলেকট্রন থাকবেই না।

একটা মাত্র উপায়ে ইলেকট্রন থাকতে পারে পরমাণুতে। সেটা হলো গোল হয়ে ঘুরা। ঠিক যেভাবে সূর্যের চারপাশে পৃথিবী ঘুরে, সেভাবে।

৩।
রাদারফোর্ডের এই খুশি বেশিদিন থাকবে না। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মডেলও বাতিল হইয়ে যাবে।
বিজ্ঞান পুরোপুরি ভুল হয় না সহজে। টমসনের মডেল বাতিল, কিন্তু ইলেকট্রন যে আলাদা একটা কণা এটা সত্যি।
রাদারফোর্ডের মডেল বাতিল, কিন্তু পরমাণুতে আসলেই একটা নিউক্লিয়াস আছে। চারপাশে আছে ইলেকট্রন।
রাদারফোর্ড হ্যাপি থাকতে থাকতে, আমরা আবার একটু পরমাণু দেখে আসি।

৪।
পরমাণু খুবই ছোট। এই অতি ক্ষুদ্র পরমাণুকে টেনে যদি আমরা একটা ফুটবল মাঠের মতো বড় করি, নিউক্লিয়াসটা হবে একটা মটরদানার মতো।

ইলেকট্রনের সাইজ কত হবে? রাদারফোর্ড জানতেন না। সত্যি কথা কি, আমরা এখনো জানি না। ২টা ইলেকট্রন কত কাছাকাছি আসতে পারে তার উপর একটা সাইজ চিন্তা করা হয়। কোয়ান্টাম থিওরির স্ট্যান্ডার্ড মডেল ইলেকট্রনকে পয়েন্ট পার্টিকেল মানে করে। আসলেই পয়েন্ট পার্টিকেল হলে, ইলেকট্রনের প্রকৃত সাইজ শুন্য।

৫।
লর্ড রাদারফোর্ডকে আমরা এত সহজে ছাড়ছি না। রাদারফোর্ড অসাধারণ শিক্ষক, তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো।
আগামী পর্বে থাকছে রাদারফোর্ডের বিশেষ সাক্ষাৎকার।

রাদারফোর্ডের একান্ত সাক্ষাৎকার

- গুড মর্নিং লর্ড রাদারফোর্ড।
- গুড মর্নিং।
- স্যার, আপনার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল। যদি কিছু মনে না করেন ...
- (লর্ড রাদারফোর্ড, পাইপ টানতে টানতে) অবশ্যই। আগ্রহী ছাত্রদের আমার সব সময় ভালো লাগে। বলো কি প্রশ্ন?
- স্যার আপনি বলেছিলেন ইলেকট্রন নাকি নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরে। কেনো বলেছিলেন স্যার?
- তার আগে আমাদের বুঝতে হবে পৃথিবী ঘুরে কেন। সেটা কি ক্লিয়ার?
- না স্যার, পুরাপুরি ক্লিয়ার না। একটু ভেজাল আছে। আপনি যদি সহজ করে বলতেন ...

- ঠিক আছে তাহলে। আগে হুকায় একটা টান দিয়ে নেই।
(টান দিলেন)
পৃথিবী ঘুরে কেন?
অনেক অনেকদিন আগের কথা। সৌরজগতের জন্মের সময়কালের সময়। একেক বালুকণা একেকদিকে যাচ্ছে। একেক পাথর একেকদিকে যাচ্ছে।
পরম গতি বলে কিছু নেই, সব বেগ আপেক্ষিক। মহান বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন আমাদের বলে গেছেন, বাইরের কোন বল না থাকলে সূর্যের চারপাশে একেকজন একেকভাবে চলতে পারবে।
এখানে বাইরের বল আছে। সূর্যের মহাকর্ষ বল। অলরেডি জন্ম হওয়া গ্রহগুলোর মহাকর্ষ বল।

যে বালু এর পাথরগুলো সূর্যের দিকে সরাসরি রওনা দিল তারা সূর্যের টানে সূর্যে পরে যাবে, অথবা পথে অন্য কোন গ্রহ উপগ্রহ তাদের খেয়ে ফেলবে ।
যে বালু এর পাথরগুলো সূর্যের উল্টাদিকে রওনা দিল তারা বেগ খুব বেশি থাকলে সৌরজগত থেকে বের হয়ে যাবে। আর বেগ কম থাকলে সূর্য আবার তাদের ব্যাক করাবে।
বাকিরা তাদের বেগের মান আর দিকের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ স্ট্যাবেল কক্ষপথে সূর্যের চারপাশে ঘুরবে, বাকিরা সূর্যে পরে যাবে।

এইটুকু ক্লিয়ার?

- তার মানে পৃথিবী যে ঘুরছে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই? যারা ঘুরে নি ঠিকমতো তারা কেউ নি, যারা টিকে আছে তাদেরকেই আমরা দেখি?
- রাইট। খুব ভালো কথা বলেছেন স্যার। একটু কি অংক করে দেখাবেন? আরও ভালো হতো।

- ঠিক আছে। সিধা হয়ে বসো। ব্ল্যাকবোর্ডে যাই।

লর্ড রাদারফোর্ড ব্ল্যাকবোর্ডে গেলেন। অনেক্ষণ ধরে লেখালেখি চলল। আমি খাতায় নোট নিলাম।

ধরি, পৃথিবীর ভর m .
সূর্যের ভর M .
সূর্যের চারপাশে গোল করে ঘুরলে পৃথিবীর বেগ প্রতি মুহূর্তে থাকে v.
পৃথিবী সূর্যের দূরত্ব R.
মহাকর্ষ ধ্রুবক G .

পৃথিবীর উপর সূর্যের টান $F_g = G\frac{Mm}{R^2}$

পৃথিবীর কেন্দ্রবিমুখী বল $F_c = \frac{mv^2}{R}$

পৃথিবীর বেগ আর সূর্যের বলের মধ্যে যদি এমন একটা ব্যাল্যান্স থাকে যে Fg = Fc হয়, তাহলেই পৃথিবী পারফেক্ট বৃত্তাকার পথে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরবে।

এত সূক্ষ্ম ব্যাল্যান্স বাস্তবে থাকে না। পৃথিবীর গতিপথ পুরোপুরি বৃত্তাকার না, কিছুটা ডিম্বাকার।
আরও ঝামেলা হলো, সূর্যের টানের চেয়ে পৃথিবীর বেগ সামান্য বেশি। পৃথিবী দিন দিন, অতি ধিরে সূর্য থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। এত ধিরে যে, এক মিটার দুরে সরতে তার ১০ লক্ষ বছরের মতো লাগে।
পৃথিবীর গতিপথ পারফেক্ট না, তবে খুবই স্ট্যাবেল।

যদি v এর মান এর বেশি হতো পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে দুরে চলে যেত। কম হলে, ঘুরতে ঘুরতে সূর্যে পরে যেত।

যেসব গ্রহ উপগ্রহের আদি বেগ পুরোপুরি সূর্যের চারপাশে বৃত্তাকার পথের স্পর্শক বরাবর থাকে, শুধু তারাই পার্ফেক্ট বৃত্তাকার পথে চলতে পারে। এত পার্ফেক্ট পথ সৌরজগতে কারো নেই। যদি পথ পুরোপুরি স্পর্শক বরাবর থাকে, তাহলে গতিপথের সব জায়গায় v এর মান সমান থাকবে। নাহলে, দুরে গেলে v এর মান কমবে, কাছে আসলে বাড়বে। সূর্যের মহাকর্ষ বল কাছে আসলে বারে, দুরে গেলে কমে। সেই বলের জন্যই বেগের কমবেশি হয়।

তারপরও, আমরা আমাদের হিসাবের সুবিধার জন্য বৃত্তাকার পথ ধরে নিব। বৃত্তাকার পথে চললে,
$F_g = F_c$
$G\frac{Mm}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$
G ধ্রুবক, M ধ্রুবক, দুই পাশ থেকে m কাটা যায়। এই দ্রুবককে সব মিলিয়ে k ধরলে পাই,
$v = \sqrt{\frac{k}{R}}$

যদি, বৃত্তাকার পথে ঘুরতে সময় লাগে T , তাহলে
$v = 2\pi R / T$
বা, $T = 2\pi R / v = 2\pi R\sqrt{\frac{R}{K}}$

k , **π**, 2 ধ্রুবক। আমরা পাই,

$T = k_1 R^{3/2}$
বা, T^2[?][?][?] R^3

এই পর্যন্ত লিখে রাদারফোর্ড থামলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, এইটা কার সূত্র জানো তো?
আমি ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়লাম।

এইটা কেপলারের তৃতীয় সুত্র। এই সূত্র বলে, আমরা মঙ্গল গ্রহ সূর্য থেকে কত দুরে জানলে, মোটামুটি বলে দিতে পারব, সে কত দিনে সূর্যের চারপাশে ঘুরবে।
আমরা বলতে পারব, বৃহস্পতির ভর কোন ব্যাপার না, সূর্য থেকে কত দুরে শুধু তার উপর নির্ভর করে তার এক বছর কত দিনে হবে।

মহামতি জোহান্স কেপলার নিউটনের জন্মের আগে আকাশের দিকে তাকিয়ে এই সূত্র আবিষ্কার করেন। তিনি গ্র্যাভিটি জানতেন না। G এর মান জানতেন না। ভাবতে অবাক লাগে না কিভাবে একজন আশ্চর্য প্রতিভাবান জ্যোতির্বিদ শুধুমাত্র আকাশের দিকে তাকিয়ে, আর খাতায় গ্রহ নক্ষত্রের ছবি এঁকে এঁকে কি সব রহস্যের সমাধান করে গেছেন?

স্যার আইজ্যাক নিউটন, প্রথম প্রমাণ করেন, যে বল আপেলকে মাটিতে ফেলে, সেই একই বল মঙ্গলকে সূর্যের চারপাশে ঘুরায়। তিনি দেখান কেপলারের সূত্র ঠিক কিভাবে, কেন কাজ করে।

সূর্য যেমন পৃথিবীকে টানে, নিউক্লিয়াসও তেমনি ইলেক্ট্রনকে টানে।
ভালবাসার টানে, পাশে আনে। ক্লিয়ার?

এটুকু বলার পর লর্ড রাদারফোর্ডের মোবাইলটা মিষ্টি সুরে বেজে উঠলো। উনি ক্লাসের সামনে যেয়ে আস্তে আস্তে মোবাইলে কথা বলা শুরু করলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখে মুখে অন্য রকম একটা ভাব চলে আসলো। তাঁর গাল একটু একটু লাল হয়ে গেল।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসলাম।

ব্যাক টু দ্যা ফিল্ড

১।
ফিল্ড কি জিনিস? খায় নাকি মাথায় দেয়? নাকি বল খেলে?
মাইকেল ফ্যারাডে ভাবছে। তার মাথায় অনেক ভাবনা।

ফ্যারাডে বড় হয়েছে অত্যন্ত গরীব ঘরে। ১৩ ১৪ বছর বয়সে স্কুল বাদ দিয়ে তাকে একটা লাইব্রেরিতে বই বাঁধাইয়ের কাজে যোগ দিতে হয়। যে বইগুলো সে বাধাই করত সেগুলো তাকে চুম্বকের মত টানত। ফ্যারাডে বই বাঁধাই করত আর বই পড়ত। ২০ বছর বয়সে সে যখন বই বাঁধাইয়ের কাজ ছেড়ে যায়, তখন সে তোমার আমার চেয়ে অনেক বিষয়ে বেশি শিক্ষিত।

আরেকটা জিনিস ফ্যারাডেকে চুম্বকের মত টানত, সেটা হলঃ চুম্বক।
ফ্যারাডে চুম্বক নিয়ে খেলতো। কাগজে চুম্বক রেখে লোহার অনেকগুলো লোহার গুঁড়া ছড়িয়ে সে দেখল এই গুঁড়াগুলো কিভাবে চুম্বকের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। প্যাটার্ন দেখে সে একটা চুম্বকের বল কিভাকে কাজ করে তাঁর একটা ছবি আঁকলো। দেখে মনে হয় চুম্বক বল কোন একটা মেরু থেকে বের হয়ে চারিপাশে ছড়িয়ে পরছে। ফ্যারাডের কাছে এই লাইনগুলো ছিল রিয়েল জিনিষ, কিছু একটা আসলেই আছে যে বরাবর এই চুম্বক বল কাজ করে। ওই কিছু একটার নাম ফোর্স ফিল্ড।

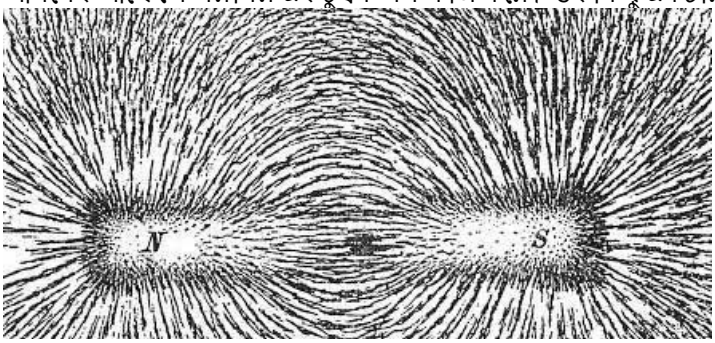

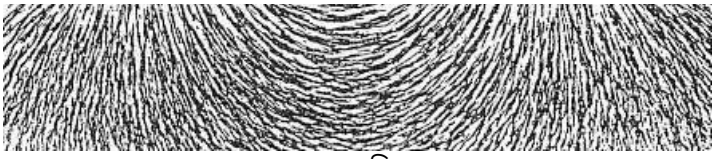

আজকে ফ্যারাডে তোমাদের বলবে ফিল্ডের গল্প।

২।
পৃথিবী আমাদেরকে টানে মহাকর্ষ বল দিয়ে। কিভাবে টানে?
মনে করো তুমি পৃথিবী। তোমার অনেক ভর। ভরে ভরে ভারি হয়ে আছো।
তোমার যে অনেক ভর এটা তো মানুষকে দেখাতে হবে, হবে না?

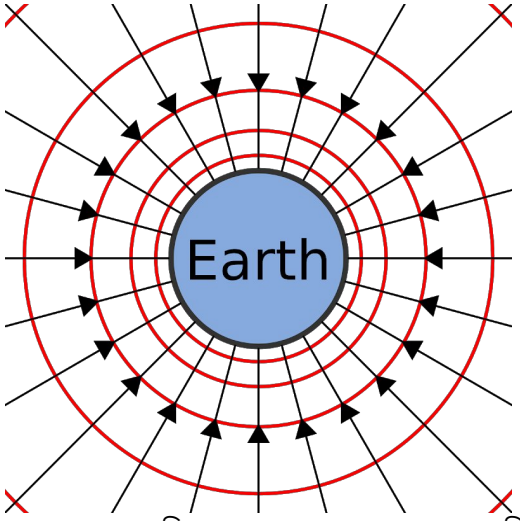

তুমি প্রতি সেকেন্ডে আশেপাশে চিঠি পাঠাতে শুরু করলেন তোমার ভরের গল্প লিখে। তোমার চারপাশ থেকে প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার ট্রেইন রওনা দেয় চিঠি বোঝাই হয়ে।
একটা ট্রেইন ডানে যায়।
একটা বামে।
উপরে যায়, নিচে যায়, সবদিকে যায়।
তোমার চারপাশ থেকে আলোর বেগে চারপাশে ছড়িয়ে পরে ফিল্ডের ট্রেইন। ট্রেইন বোঝাই চিঠিঃ পৃথিবী তার ভর শো অফ করছে, দেখতে হলে পৃথিবীর কাছে যাও।

যে মহিলাটা পৃথিবীর পাশের বাসায় থাকে (চাঁদের বুড়ি), তার গায়ের উপর দিয়ে অনেকগুলো ট্রেইন যায়। সে দশটা বিশটা করে চিঠি পায়। পৃথিবীর ভরের গল্পে সে প্রবল আকর্ষণ বোধ করে।
দূরের জুপিটার চিঠি পায় খুবই কম। পৃথিবীর ভর সে খুব একটা কেয়ারও করে না।

যে পৃথিবী থেকে ১ কিলোমিটার দূরে আছে তার গায়ের উপর দিয়ে যদি ১০০টা ট্রেইন যায়, যে দুই কিলো দূরে আছে তার গায়ের উপর দিয়ে যাবে ২৫টা। তিন কিলো দূরের লোক ট্রেইন দেখবে প্রায় ১১টা। মহাকর্ষ তাই দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতে কমতে থাকে।

ফিল্ডের ট্রেইন শূন্যের মধ্য দিয়ে বলের বার্তা পৌঁছে দিয়ে আসে দূর দূরান্তে। তুমি ১০টা চিঠি পাবে, ১০ গুন উৎসাহে রওনা দিবেন পৃথিবীর দিকে।

৩।
এইবার একটু কাজের কথায় আসি।
বলের দুইটা অংশ। একটা অংশ বল গ্রহণ করে, আরেকটা অংশ সেই বলের উপর ভিত্তি করে ত্বরণ দেয়।
দ্বিতীয় অংশটা আমাদের সবার পরিচিত। সেটা আসে নিউটনের সূত্র থেকে। কোন m ভরের গাড়িতে যদি আমি F বল দেই আর সেটার ত্বরণ যদি হয় a তাহলে,
$F = ma$
একই বল দিলে, যার ভর বেশি হবে, তার ত্বরণ হবে কম। আর যার যার ভর কম হবে, তার ত্বরণ হবে বেশি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বল আমি কিভাবে নিবো? কে কিভাবে বল নিবে কি পরিমাণ বল নিবে, আর বল নিয়ে কোন দিকেই বা যাবে সেটা যে জিনিসের উপর নির্ভর করে, ঠিক করে দেয় ফিল্ডের মান বা তীব্রতা।

ধর আমি আলুর ব্যবসায়ী আক্কাস আলী। আমি আমার বাসা থেকে চারদিকে বল সাপ্লাই দেই। আমার বলের নাম হচ্ছে আক্কাস বল। এই বল নির্ভর করে টাকার উপর। যে বেশি টাকা দিবে, সে বেশি বল পাবে। এই বলকে তার ভর দিয়ে ভাগ দিয়ে তার ত্বরণ পাওয়া যাবে।

এক টাকা দিয়ে যে পরিমাণ বল কিনতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ফিল্ডের মান। এই ফিল্ডের নাম দিলাম Akkas, সংক্ষেপে A_k। টাকা পেয়ে কেউ যদি আক্কাস আলীর দিকে ছুটে আসে আসে তাহলে আমরা ফিল্ডের আগে মাইনাস চিহ্ন বসাই। আর টাকা দিয়ে বল কিনে যদি উল্টা আক্কাস আলীর থেকে দূরে পালিয়ে যায় তাহলে ফিল্ডের মান হবে পজিটিভ।
এই বল গ্রহণের সমীকরণ তাই

$$F = tk \times A_k$$

ইলেকট্রিক বল নির্ভর করে টাকা না, আধানের উপর। যার যত আধান, সে তত বেশি বল কিনতে পারে। একক আধান দিয়ে যে পরিমান বল পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে এই বলের ফিল্ডের মান, কঠিন বাংলায় একে বলে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য (Electric Field Intensity). আধানকে q দিয়ে আর এই ফিল্ডের মানকে E দিয়ে প্রকাশ করলে আমরা পাই,

$$F = q \times E$$

তড়িৎ ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে একটা একক ধনাত্বক আধান বসালে সেটা যে বল অনুভব করবে, তাই হচ্ছে এর ফিল্ডের মান। ধর যে, Q আধান ফিল্ড ছড়াচ্ছে। সেই ফিল্ডের কোন বিন্দুতে Q থেকে r দূরত্বেআমরা আরেকটা আধান q বসালাম। তাহলে, কুলম্বের সূত্র থেকে আমরা পাই,

$$F = q \times E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Qq}{r^2}$$

বা, $$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}$$

ঠিক তেমনি, নিউটনের মহাকর্ষ বল নির্ভর করে ভরের উপর। গ্র্যাভিটি ক্ষেত্রে কোন বিন্দুতে একটা একক ভর বসালে সে যে বল অনুভব করে, তাকে বলে গ্র্যাভিটি ফিল্ড ইন্টেন্সিটি, সংক্ষেপে ফিল্ডের মান। ধরি, এই ফিল্ডকে প্রকাশ করে Γ দিয়ে। তাহলে,

$$F = m \times [?][?]$$

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের সাথে মিলিয়ে আমরা পাই,

$$F = m \times [?][?] = G\frac{Mm}{r^2}$$

বা, $$[?][?] = G\frac{M}{r^2}$$

খেয়াল করলে ধরতে পারবা, এই উদ্ভট ক্যাপিটাল গামা জিনিসটা আসলে কোনদিন গ্র্যাভিটি ফিল্ড বুঝাতে ইউজ হয় না। এই চিহ্ন আসলে আমরা রেখে দিয়েছি জেনারেল রিলেটিভির ক্রিস্টোফেল সিম্বলের জন্য। তার বদলে, গ্রাভিটির ফিল্ডের মান বুঝানোর জন্য খুব সহজ একটা চিহ্ন আমাদের আছে। কেউ বলতে পারবা সেটা কি?

রাইট। সেটা হচ্ছে আসলে অভিকর্ষজ ত্বরণ g. গ্র্যাভিটির ফিল্ড তীব্রতা g আসলে জাস্ট একটা ত্বরণ!

$$[?][?] = g = G\frac{M}{r^2}$$

৪।
আগামী চ্যাপ্টারে আমরা যখন সিরিয়াস কথাবার্তায় ঢুকব, তখন ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভের ধারণাটা আমাদের প্রয়োজন হবে। এই ওয়েভ চলে ফিল্ডের মান কমিয়ে বারিয়ে। ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মান পরিবর্তন করে, ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ডের। এই দুই ফিল্ড থাকে একে অপরের লম্ব বরাবর। তরঙ্গের ক্ষেত্রে, ফিল্ডের মান যত বেশি, সেটাকে আমরা তত বড় রেখা দিয়ে বুঝাই। ধর ফিল্ডের মান পাঁচ একক হলে আমরা একটা লম্বা তীর চিহ্ন দেই, চার একক হলে একটু ছোট এরকম। এগুলো বুঝায় ফিল্ডের মান, সত্যিকারের উঠা নামা না। উপরের দিকে তীর দিয়ে আমরা পজিটিভ ফিল্ড বুঝাই, তার মানে হচ্ছে বিকর্ষণ। আর নিচের দিকে দিয়ে বুঝাই আকর্ষণ। এই ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক তরঙ্গকেই আমরা আলো হিসাবে চিনি, ফোটনের ধারনার আগে এটাই ছিল আলোর একমাত্র রূপ।

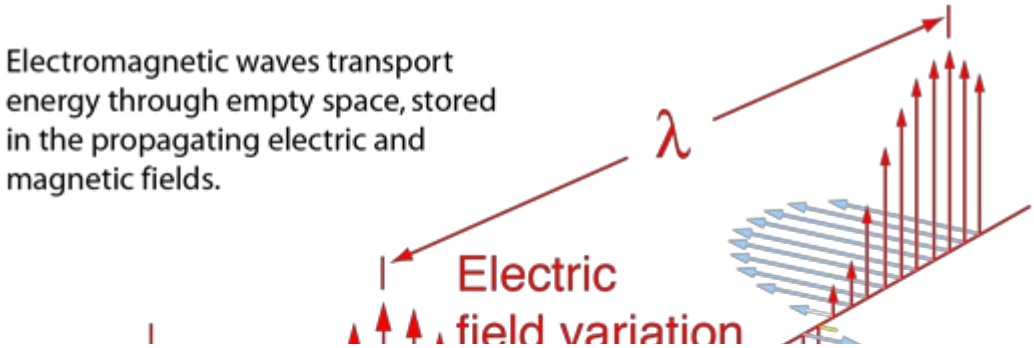

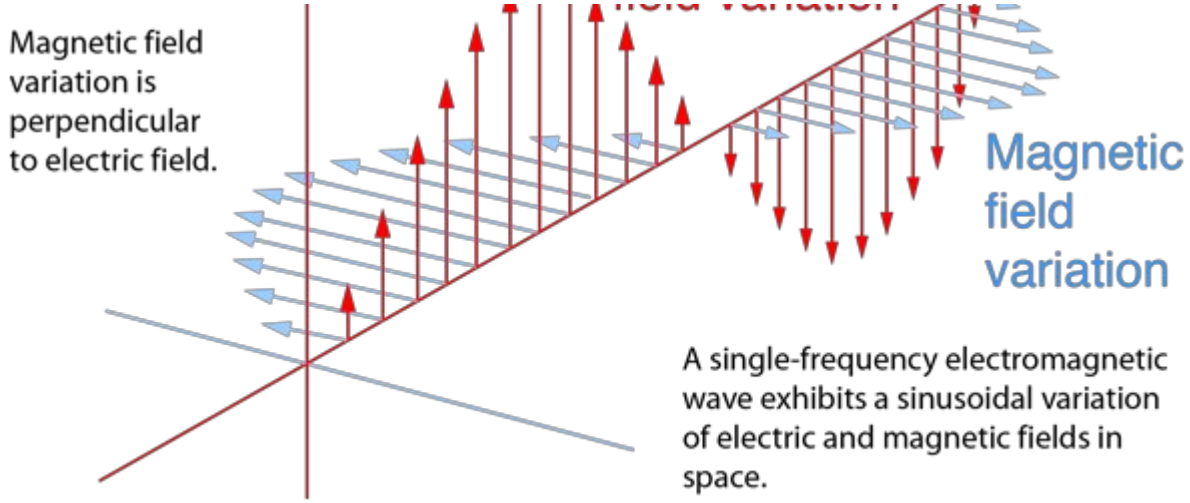

এইবার ভাব তো, ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভের মানে আলোর উপর একটা আধান, যেমন ইলেকট্রন বসালে কি হবে? সেটা প্রথমে বিকর্ষণ ফিল করবে, এই বিকর্ষণের মান আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। এক সময় বিকর্ষন ম্যাক্সিমাম মানে পৌঁছলে তারপর বিকর্ষণের মান কমতে থাকবে। কমতে কমতে সেটা শূন্য হবে। এবার শুরু হবে আকর্ষণ।
তার মানে, আলো আধানকে একবার দূরে ঠেলবে, একবার কাছে ঠেনে নেবে। ইলেক্ট্রন কাঁপতে থাকবে আলো পেলে। ক্লিয়ার?

৫।
মোটামুটি এইভাবে ফিজিক্সে ফিল্ডের ধারণাটা এসেছিল, বল থেকে। পরে ফিল্ডের ধারণা আরও বড় হয়েছে। আগে যেমন ফিল্ড বলতে বুঝাতো এমন একটা জিনিস যেটা বলের মান আর দিক ঠিক করে দেয়, সেটা ছাপিয়েও ফিল্ড শব্দটা সব জায়গায় ইউজ হওয়া শুরু হয়ে গেল। ফিল্ডের জেনারেল ডেফিনিশন তাহলে হচ্ছে, স্পেস টাইমের কোন বিন্দুতে কোন কিছুর মান। সেটার সাথে বলের সম্পর্ক থাকতে পারে, নাও পারে।

তুমি যদি বল, স্পেস টাইমের প্রতিটা বিন্দুতে তাপমাত্রা আছে, সেটার জন্য ফিল্ড নিয়ে আসবা তাহলেও খুব একটা ভুল হবে না। আবার যদি বল প্রতিটা বিন্দুতে বায়ুপ্রবাহ একটা ফিল্ড, সেটাও আসলে চলে। আগের মত এইসব জেনারেল ফিল্ডের জন্য আসলে কোন সোর্স লাগে না। ধরে নেওয়া যায়, স্পেস টাইমের প্রতিটা বিন্দুতে এইসব ফিল্ডের কোন মান আছে, দিক আছে। সেই মান শূন্যও হতে পারে।

যখন আমরা সত্যি সত্যি কোয়ান্টাম মেকানিক্স বুঝা শুরু করবো, তখন আমরা অন্য এক ধরনের ফিল্ডের কথা বলব। সেই ফিল্ড থেকে বুঝা যাবে কোন জায়গায় কণাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কিরকম। শুধু যে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা, তাও না। কণার ভরবেগের সম্ভাবনা, স্পিনের সম্ভাবনা এগুলোও সব নানান জাত বেজাতের ফিল্ড দিয়ে বুঝানো হবে। এই সব ফিল্ড কিন্তু ঠিক বলের সাথে রিলেটেড না, ধরে নাও এটা জাস্ট স্পেস টাইমের এক ধরণের ধর্ম। এই গল্পগুলো আমরা পরের চ্যাপ্টারের জন্য রেখে দিলাম।

যাই হোক, অনেক কথা হলো। আপাতত, আমাদের পরিচিত, প্রচলিত বলের ফিল্ডে ব্যাক করছি।

৬।
পৃথিবী মহাকর্ষ ফিল্ড ছড়াচ্ছে। ইলেকট্রন ছড়াচ্ছে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড।
পৃথিবী অহংকারী হলেও ভালো মানুষ। তার চিঠিতে লেখা থাকে, তোমরা যেই হও, দেখে যাও, আমি কত সুন্দর, সরি, ভারি। চা নাস্তার ব্যবস্থা করেছি, বেড়িয়ে যাও।
ইলেকট্রনের ওই ফিল্ড অত ভালো না। ওখানে লেখা থাকে, তুই ইলেকট্রন হলে দূরে গিয়ে মর। আর পজিটিভ জিনিস হলে কাছে আয়।

ঝামেলা হবে, ফিল্ড ছড়ানোর পর ওই ফিল্ডের মধ্যে নিজেই গোল করে ঘুরা শুরু করলে।

ইলেকট্রন একটু আগে ফিল্ড ছড়িয়েছে। একটু পর গোল করে ঘুরতে ঘুরতে নিজেই ওই ফিল্ডের মধ্যে যাবে, আর লেখাটা পড়বে, তুই ইলেকট্রন হলে দূরে গিয়ে মর!
একটু আগে নিজের ছড়ানো ফিল্ড ইলেকট্রনকে ধাক্কা দিবে। ওই ধাক্কা ঠেলে চলতে গেলে তার গতি কমে যাবে। সে গতিপথ থেকে ছিটকে একটু ভেতরের দিকে চলে আসবে। আবার চলার চেষ্টা করবে, আবার ধাক্কা খাবে।

ইলেকট্রন গোল করে ঘুরবে। তার চারপাশে ফিল্ডের লাইনগুলো কাঁপবে। এই কাঁপুনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। জন্ম হবে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের।

শ্রদ্ধেয় জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল হিসাব কষে দেখিয়েছেন কিভাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড চেঞ্জ হলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড চেঞ্জ হয়, ম্যাগনেটিক হলে আবার ইলেকট্রিক। আলোর বেগে আলো ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। আমরা বলব, খুব হ্যাপি একটা ইলেকট্রন আলো দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আর ওইদিকে ফিল্ডের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে স্পাইরালের মতো ঘুরতে ঘুরতে বেচারা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসে যেয়ে পড়বে।

এক সেকেন্ডের কয়েক কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল ধ্বংস হয়ে যাবে। বুম।

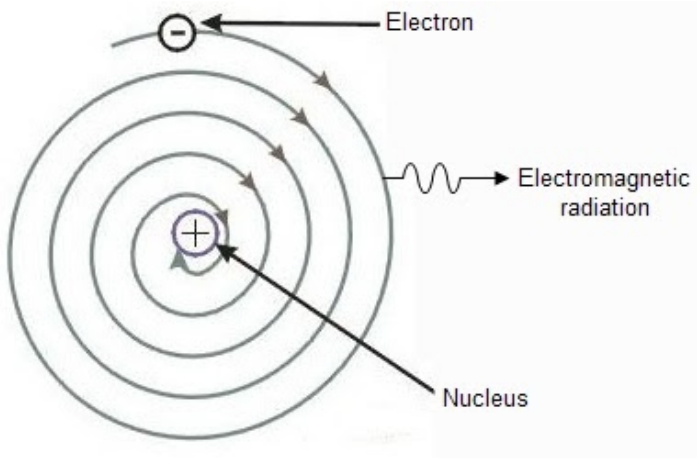

৪।
পর্দা উঠে গেছে, মঞ্চে আসছেন নীলস বোর। প্রথমে চলো শুনে আশি বোরকে নিয়ে লেখা একটা সায়েন্স ফিকশন।

পাটকেল বিটকেল পার্টিকেল

১।
দিন ১:
নীলস বোর অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁর সামনে আশ্চর্য এক বাক্স। পুরু টাইটেনিয়ামের দেয়াল। পুরু শেকল দিয়ে আগাগোড়া মোড়ানো। মস্ত এক তালা ঝুলছে ওই বাক্সের সামনে।
সাতদিন আগে অজানা ঠিকানা থেকে ডাকযোগে বাক্সটা পাঠানো হয়েছে। আজকে অনেক চেষ্টার পর বাক্সটা খোলা হয়েছে। বোর তাকিয়ে আছেন বাক্সের দিকে নয়, ওই বাক্স থেকে যে জিনিসটা বেরিয়েছে সেটার দিকে।
এই মুহূর্তে জিনিসটা থরথর করে কাঁপছে। আকার আকৃতি ঠিক বোঝার কোন উপায় নেই, এতো কাঁপছে। কি দিয়ে তৈরি বোঝা যাচ্ছে না। সলিড হতে পারে, থকথকে জেলি টাইপেরও হতে পারে। এক ধরনের আলো বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মারছে তার গা থেকে।
বোর কাপাকাপা হাতে জিনিসটাকে ধরার চেষ্টা করলেন। ছুঁতে পারলেন না। মনে হলো, বাতাসের একটা শক্ত আবরণ জিনিসটাকে ঘিরে রেখেছে, ওই আবরণ ভেদ করে তাকে ধরা যায় না।

দিন ২:
আজকে একটা পরীক্ষা করা হয়েছে। জিনিসটাকে শক্ত করে চেপে ধরে তার আকার আকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। খুব একটা লাভ হয় নি। চেপে ধরাতে কাঁপুনি কমেছে, কাঁপুনি কমে যাওয়ার পর তার শেপ আরও অস্পষ্ট হয়েছে।
শেপ যতটুকু বোঝা যায় তাতে আরেকটা উদ্ভট জিনিস ধরা পরেছে। জিনিসটাকে সামনে নিয়ে একবার ঘুরালে তার চেহারা চেঞ্জ হয়ে যায়। পুরো দুই পাক অর্থাৎ ৭২০ ডিগ্রি ঘুরালে তার আগের চেহারা ফিরে আসে। বোর বেশ অস্বস্তিতে আছেন।
মন্দের ভালো জিনিসটার আজকে একটা নাম দেওয়া হয়েছে। বিটকেল, পাটকেল এসবের সাথে মিলিয়ে তার নাম রাখা হয়েছে পার্টিকেল।

দিন ৩:
এই জিনিস ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। কোন লজিকে এগুলো খাটে না। কিন্তু এগুলো হচ্ছে।

আজকে একটা পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল, পারটিকেল ছোড়াছুড়ির পরীক্ষা। পার্টিকেলটাকে ছুড়ে মারা হবে, সামনে দুইটা দরজা থাকবে। ওইপাশে একটা পার্টিকেলটা আছড়ে পড়বে। তার ছবি উঠবে।
এত সব ঝামেলা কেন বলি। পার্টিকেলটাকে ছুড়ে মারলে ওইটা কথায় যায় ঠিক বোঝা যায় না। বন্দুক থেকে গুলির মতো পার্টিকেল বের না হয়ে মনে হয় একদলা মেঘ বের হচ্ছে। ওই মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। মেঘটাকে না থামান পর্যন্ত ওর মধ্যে পার্টিকেল কোথায় আছে দেখার কোন উপায় নেই।
পরীক্ষায় ঝামেলা কমলো না, বরং বাড়ল। দেয়ালের ছবি দেখে মনে হচ্ছে পার্টিকেল একই সাথে দুই দরজা দিয়ে ঢোকে।
এ হতে পারে না। বোর দরজার সামনে করা নজর বসালেন। আজকে পার্টিকেল ব্যাটাকে ধরতে হবে। একই সাথে দুই দরজা দিয়ে যায়? ফাইজলামি নাকি?
নজর বসানোর সাথে সাথে পার্টিকেল ভদ্র হয়ে গেল। সে একেকবার একেক দরজা দিয়ে যায়, কখনোই একই সাথে দুই দরজা নয়!

দিন ৪:
অনেক রাত। একটা শব্দে বোরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার বিছানার পাশে টেবিলটাতে বসে আছে পার্টিকেলটা। থরথর করে কাঁপছে। একটু টাইম লাগল সমস্যাটা বুঝতে। পার্টিকেল থাকে টাইটেনিয়ামের বাক্সটাতে তালা দেওয়া অবস্থায়। ওই তালার চাবি শুধু তাঁর কাছে। পার্টিকেল এখানে আসলো কি করে?
বোর বাক্স খুললেন। সব ঠিকঠাক আছে। কেউ তালা খুলে নি। পার্টিকেল্টাও বক্সের ভেতর কাঁপছে, বের হয় নি।
মাথা চুলকাতে চুলকাতে বাক্সে তালা দিয়ে বোর বের হয়ে এলেন। সাড়া দিনের পরিশ্রমে হয়তো ভুল দেখেছেন। বিছানার পাশে টেবিলে পার্টিকেল নেই। সব ঠিকঠাক আছে।
গায়ে কম্বল জড়াবেন, কিসে যেন পা ঠেকল। বিছানার উপর পায়ের কাছে শুয়ে আবারো কাঁপছে পার্টিকেলটা। ওটারও মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে।

২।
বৃদ্ধ নীলস বোর ঘুম থেকে ধরমর করে উঠলেন। তাঁর সাড়া জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী আইনস্টাইন কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তাঁরও যাবার সময় হয়ে এসেছে।
তাঁর সাড়া জীবনটাই কেটেছে স্বপ্নের মতো। এতগুলো বছর গেল, এত এত গবেষণা হলো, এখনও কেউ বুঝতে পারলো না পার্টিকেল আসলে কি জিনিস! কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন আসলে কি মিন করে।

বোরের মনে পড়ল সেই ছেলেবেলার কথা। সহজ সরল উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা।
আজকের যুগে ছেলেমেয়েরা এই কোচিংএ পড়ে, ওই টিচারের কাছে পড়ে। এই কোচিংএ পড়লে নাকি জিপিএ 5 পাওয়া যাবে, ওইটাতে নাকি বুয়েট নিশ্চিত!
বোরের হাসি আসলো। প্রফেসর রাদারফোর্ডের এগার জন ছাত্র নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল। রাদারফোর্ড সাইনবোর্ড টাঙালে কেমন হতো,
"দি রাদারফোর্ড কোচিং সেন্টার। পড়লে নোবেল প্রাইজ পাওয়া যাবে। বিফলে মূল্য ফেরত।"

একটা বোরিং গল্প

১।
নীলস বোরের ছোটবেলা কেটেছে প্রচণ্ড দুঃখ দুর্দশার মধ্যে। দারিদ্রের সাথে পাঞ্জা লড়ে, কষ্ট করতে করতে তিনি মানুষ হয়েছেন। তীব্র অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি সোনার মানুষ হয়েছেন।

না।
গল্পটা এই টাইপের হলে খুবই এক্সাইটিং হতো, অনেকের আবেগে চোখ দিয়ে দুই চার ফোটা পানিও বের হয়ে যেত, গল্পটা এরকম না।

ডেনমার্কের কোপেনহ্যাগেনে গাটসমেয়ার গার্ড নামে একটা প্রাসাদতুল্য বাড়িতে নীলস বোরের জন্ম। বাবা নামকরা ফিজিওলজিস্ট।

মা অত্যন্ত ধনী আর অভিজাত মহিলা। নীলস বোর ডেফিনিটলি চিন্তা করতে ভালবাসতেন, কিন্তু কষ্ট করে লেখালেখি তাঁর পোষাত না। বোরের ডক্টরেট থিসিসও নাকি তাঁর মা লিখে দেন!

এই গল্প থেকে আমরা কি শিখলাম? শিখলাম যে বিজ্ঞানী হতে হলেই যে গরীব দুঃখী পরিশ্রমী হতে হবে এমন কোন কথা নাই। বোর এখন অঙ্ক করছে, তার মা মাথার কাছে দুধ নিয়ে বসে আছে। তাকে বিরক্ত না করে বরং তার বইগুলো দেখে আসি।

২।
এইটা বোরের ফিজিক্স বই। এইখানে তরঙ্গের কথা আছে। দেখি কি লিখেছে ...

পানিতে ঢিল ছুড়লাম। ঢিলের ভারে পানির কিছু কণা সরে গেল। ওই কণাগুলো আশেপাশের কণাকে ঠেলে তুলবে। একটা কণা তার পাশের কণাটাকে তুলবে, ওই কণা তুলবে তার পাশেরটাকে। যত জোরে ঢিল মারা হবে, তত বেশি শক্তি হবে, তত বড় ঢেউ হবে। একসময় অভিকর্ষের কাছে ঢেউ হার মানবে, উপরের দিকের কণাগুলো আছড়ে পরবে। পরার সময় আবার পাশের কণাগুলোকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তুলবে। আবার আছড়ে পরবে। আবার টেনে তুলবে।
যদি মনে করি পানির তরঙ্গ X অক্ষ বরাবর যাচ্ছে, আর তরঙ্গের চুড়ার কণাগুলোর উচ্চতা হয়
0 1 2 2.5 3 2.5 2 1 0 -1 -2 -2.5 -3 -2.5 -2 -1 0
তাহলে তরঙ্গের বিস্তার 3. কোন দিকে তরঙ্গ হায়েস্ট 3 একক উঠে। তাই এর বিস্তার তিন।
পরপর দুইটা একই দিক থেকে আসা শূন্যের মাঝখানে কণা আছে কয়টা? ১৬টা। এই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১৬।

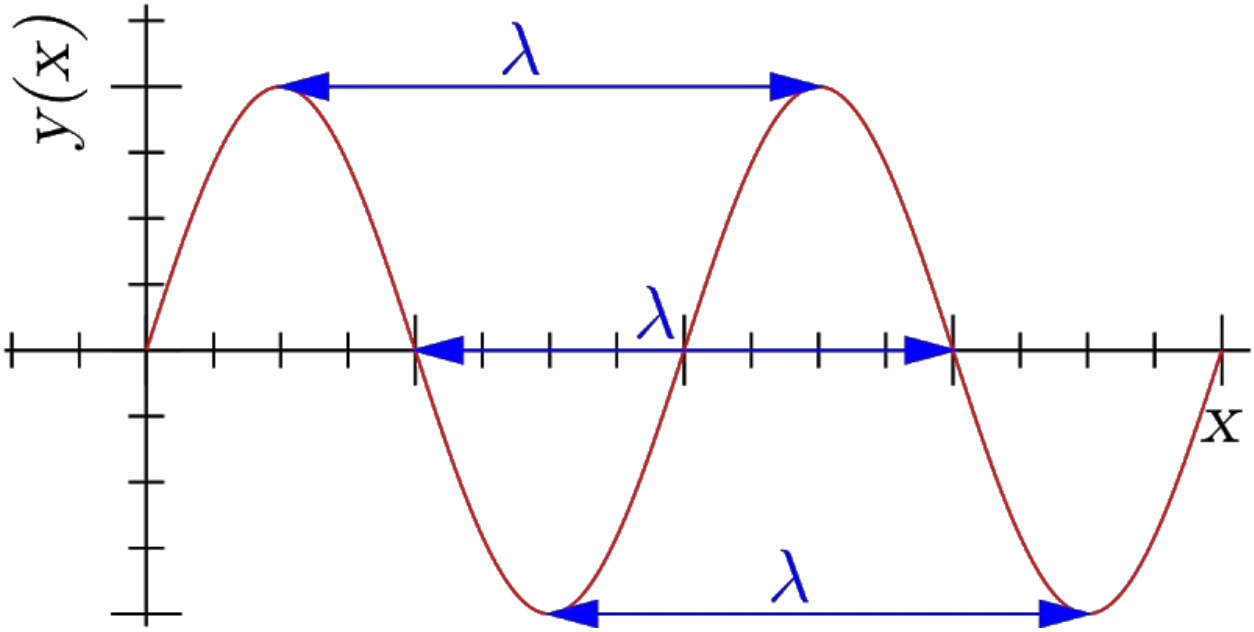

যদি এক তরঙ্গদৈর্ঘ্য যেতে সময় লাগে .1 সেকেন্ড, ১ সেকেন্ডে ১০টা তরঙ্গদৈর্ঘ্য যায়। এই সময়ে একটা কণা 0 থেকে 3 পর্যন্ত উঠে, আবার 0 তে নেমে আসে, তারপর -3 তে নামে, তারপর আবার 0 তে ফিরে আসে। আমরা বলি, তরঙ্গের পর্যায়কাল 0.1 সেকেন্ড। ফ্রিকোয়েন্সি ১০।
ক্লিয়ার?

তরঙ্গ উঠছে নামছে। রাদারফোর্ডের ইলেকট্রন পরমাণুর চারপাশে ঘুরছে। বোরের মা দুধ নিয়ে বসে আছে। বোর অঙ্ক করছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে সিনেম্যাটিক মিউজিক বাজছে। এইসব বোরিং দৃশ্য দেখতে দেখতে বোর বড় হয়ে যাবে। টাডা!

৩।
বোর রাদারফোর্ডের কাছে পড়েছে। সরি, পড়েছেন। রাদারফোর্ডের এগারো জন ছাত্র নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। বোরও রেডি হচ্ছেন।

রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলে ইলেকট্রন ঘুরতে ঘুরতে নিউক্লিয়াসে পরে যাবে। যদি না পরতো কি হতো?

ধরি, মূল বিন্দুতে একটা বৃত্ত আঁকা হয়েছে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ ১ । ইলেকট্রন ঘুরছে ওই বৃত্ত বরাবর।
যখন x = 1, y = 0
ইলেকট্রন বৃত্ত বরাবর উপরে উঠে। আস্তে আস্তে x কমবে, y বাড়বে।
বৃত্তের ব্যাসার্ধ একই থাকবে।
ব্যাসার্ধ হলো অতিভুজ। সাইন থিটার মান লম্ব/অতিভুজ।

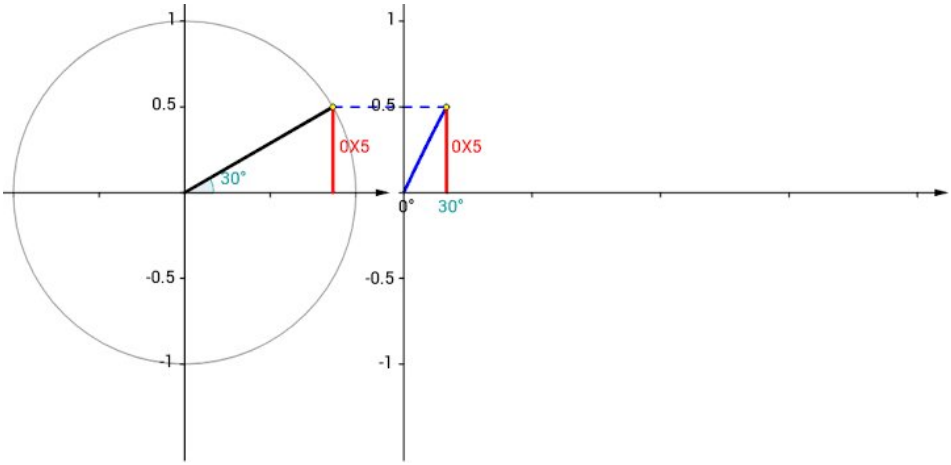

আসতে আসতে থিটার মান বাড়িয়ে সাইন থিটার ছবি আঁকলে হবে একটা পার্ফেক্ট সাইন কার্ভ।

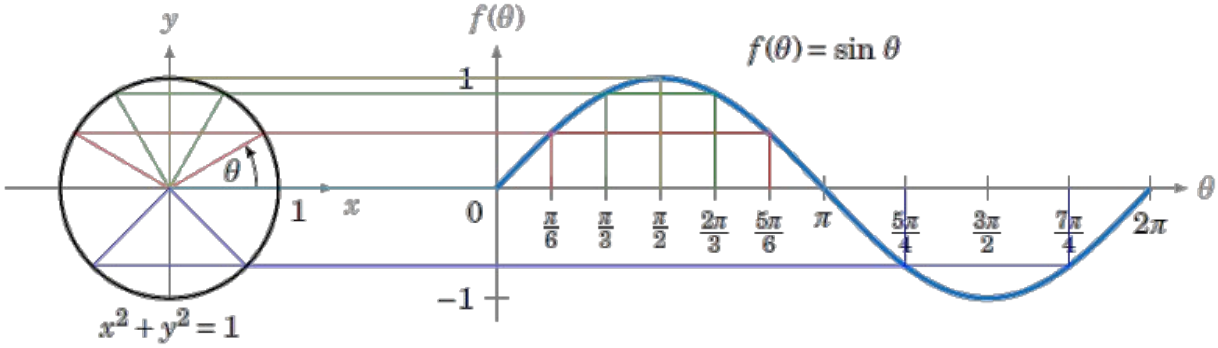

ইলেকট্রন ঘুরবে, তার ফিল্ড সাইন কার্ভের মতো কাঁপবে। আলোর তরঙ্গ ছড়াবে চারপাশে। ইলেকট্রনের ঘুরে আসতে যদি সময় লাগে T সেকেন্ড, তাহলে এক সেকেন্ডে ইলেকট্রন ঘুরবে f = 1/T বার।
ওই আলোর কম্পাঙ্ক f.

শুধু একটাই সমস্যা, ইলেকট্রন বিকিরণ করতে করতে আরও ছোট আরও ছোট ব্যাসার্ধের পথে ঘুরবে। একসময় নিউক্লিয়াসে পরে যাবে।

রাদারফোর্ডের মডেলকে বাঁচানোর একটা মাত্র উপায়। ইলেকট্রন ঘুরবে কিন্তু বিকিরণ করবে না।
কিভাবে সম্ভব?
ধরো, এইটা ATM বুথ। শুধু ৫০০ আর ১০০০ টাকার নোট দেয়। তুমি যখন টাকা তুলতে পারবা ৫০০ আর ১০০০ এর গুণিতকে। যা খুশি না।

বোরের মাথায় আইডিয়ার বাত্তি জ্বলল। পরমাণু একটা ৫০০ টাকার ব্যাঙ্ক। যখন ইলেকট্রন ঘুরে তার কম্পাঙ্ক থাকে f. কয়েকদিন আগে প্ল্যাঙ্ক আর আইনস্টাইন বের করেছেন E = hf.
সমাধান হলো, ইলেকট্রন পরমাণুর চারপাশে অনেকগুলো কক্ষপথে ঘুরতে পারে।
একটা কক্ষপথে যখন ঘুরবে, শক্তি শোষণ বিকিরণ কিছুই করবে না। সে ৫০০ টাকার জন্য অপেক্ষা করবে। যদি সে কোনভাবে ৫০০ টাকা পায়, ওই টাকা দিয়ে ব্যাঙ্ককে ফিরিয়ে দিয়ে সে নিচের স্তরে যাবে। আবার কখনো কখনো ব্যাঙ্ক থেকে ৫০০, ১০০০ টাকা নিয়ে উপরে উঠবে।

hf পরিমাণ শক্তি শোষণ করলে ইলেকট্রন লাফ দিয়ে এক নাম্বার থেকে দুই নাম্বারে যায়। বিকিরণ করলে আবার ব্যাক করে। ওই বিকিরণ আমরা দেখি তরঙ্গ আকারে। দুই স্তরের শক্তির পার্থক্য ডেল্টা E হলে, ΔE = hf.

এর পরে নীলস বোর খুব অসাধারন একটা কাজ করলেন। তিনি হিসাব করে বের করলেন, ঠিক কোন শর্ত দিলে দুই কক্ষপথের শক্তির পার্থক্য ΔE = hf আসে। আমার জানা নেই সেই মুহূর্তে বোরের মাথায় ঠিক কি বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিলো। জানলে অবশ্যই তোমাদের বোরের মাথার ভেতর থেকে ঘুরিয়ে আনতাম।

নীলস বোর একটা সাদা কাগজ বের করলেন। তারপর লিখলেন,
ইলেক্ট্রনের ভর m আর বেগ v হলে, ভরবেগ হচ্ছে mv.
যে বৃত্তাকার পথে সে ঘুরে সেটার ব্যাসার্ধ r হলে পরিধি $2\pi R$.

তাহলে, হিসাব মেলে, যদি,
ভরবেগ * পরিধি = nh হয়।

$$mv \times 2\pi R = nh$$

বা, $$mvR = \frac{nh}{2\pi}$$

ইলেক্ট্রনের কৌণিক ভরবেগ h/2π এর সরল গুণিতক।
এই গুণিতকের বোর নাম দিলেন প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা n.

এইখানে n হচ্ছে কক্ষপথের নম্বর।
এক নাম্বার কক্ষপথে n = 1, ২ নাম্বারে n = 2 এরকম।

৪।

নীলস বোর তাঁর হিসাব মেলানোর জন্য লিখেছিলেন $mvR = \frac{nh}{2\pi}$
এটা যে কতো অসাধারণ একটা আবিষ্কার তিনি জানতেন তা।

বহু বহুদিন পর লুই ডি ব্রগলি তাঁর কণা তরঙ্গের দ্বৈততার সাহায্যে ব্যাখা দিবেন এই সূত্রের। পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে আসবে এমন এক অসাধারণ জগৎ, আমাদের পরিচিত কোন কিছুর সাথেই যার কোন মিল নেই।
বোর তার কিছুই জানতেন না।
একেবারে প্রায় কিছুই না জেনে শুধুমাত্র পরীক্ষার সাথে মেলানোর জন্য বোর যে আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা দেখে আমার বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে যায়।

৪।
অনেকদিন ধরে ভাবাভাবি হয় না। একটু আগে বললাম, বহুদিন পর লুই ডি ব্রগলি দেখাবেন, ইলেকট্রন একই সাথে কণা আর তরঙ্গ।
তোমরা কি একটু ভাববে, একটা জিনিস কিভাবে কণা আর তরঙ্গ দুইই হতে পারে?
তোমার পোষা বিড়ালটা একই সাথে কণা আর তরঙ্গ, এই কথার মানে কি আসলে?
তরঙ্গ হতে হলে তো কাউকে উঠতে নামতে হবে। কে উঠে নামে?
বিড়াল নিজেই?

ভাবো।
বাঁচতে হলে, ভাবতে ববে।

৬।
দুই স্তরের শক্তির পার্থক্য ছিল $\Delta E = hf$. এই জিনিস থেকে বোর বের করে ফেলবেন বর্ণালীর রহস্য।
চলো ঘুরে আসি বোরের রঙ্গিন দুনিয়া থেকে।

বোরের বর্ণালি

১।
একটা পরমাণুর গায়ে লেখা থাকে তার নাম।
পড়তে হলে, ওই পরমাণুর মৌলের গ্যাস বানিয়ে তার উপর সাদা আলো মারতে হবে।
ওই আলো তারপর প্রিজম দিয়ে পাস করবে, পেছনে পর্দায় পড়বে সাত রঙের বর্ণালি।
বার্জারের কালার ব্যাঙ্ক সেখানে থাকবে কল্পনার সব রঙ, সবগুলো রঙ!
শুধু কয়েকটা বাদে।

যে রঙগুলো বাদ পড়বে সেগুলো বর্ণালিতে অন্ধকার সূক্ষ্ম রেখার মতো দেখা যাবে।
কোন কোন রঙ বাদ পড়েছে, কোথায় কয়টা কালো রেখা পড়েছে দেখে বলে বলে দেওয়া যাবে মৌলের পরিচয়।
মৌল তোমার নাম কি? রঙে পরিচয়!

(এই ধরনের বর্ণালির নাম শোষণ বর্ণালি। উলটা বর্ণালিও তৈরি করা সম্ভব, যেখানে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে অল্প কিছু আলোর রেখা থাকবে।)

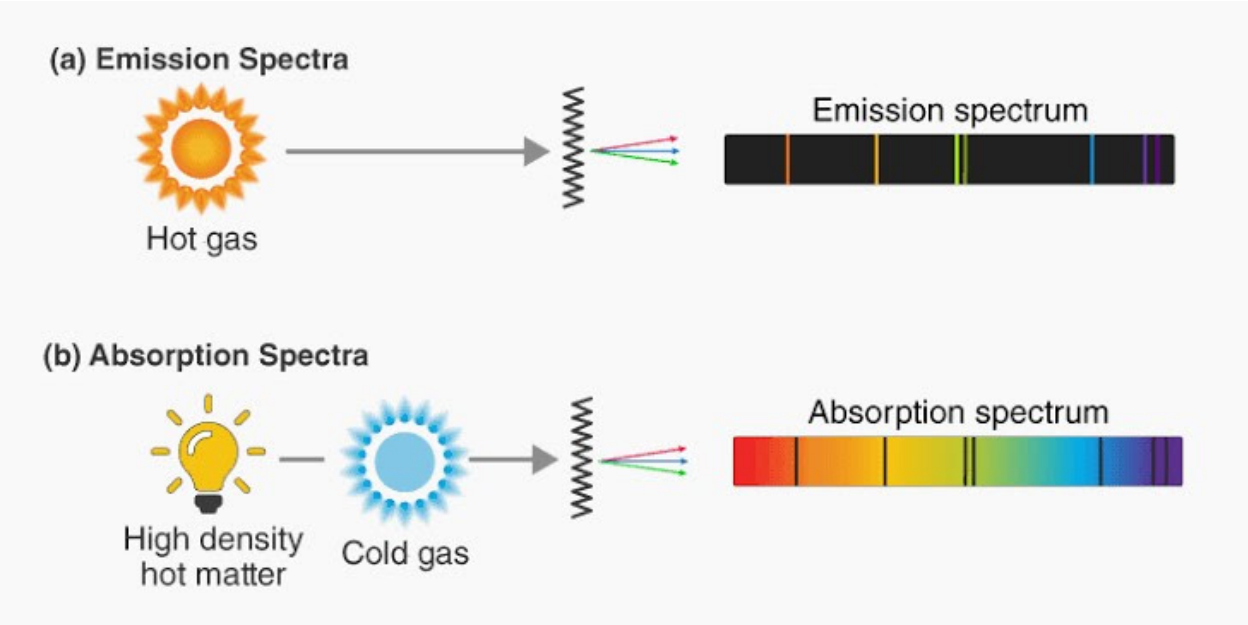

২।
বহুদিন ধরে ওই রেখাগুলো বিজ্ঞানীদের ভাবিয়েছে।
তারা জেনেছেন, প্রতিটা মৌলের জন্য আলাদা আলাদা রেখা আছে।
ওই রেখাগুলো সূর্যের বুকে হিলিয়ামের গল্প বলে।
লাল দানব তারার বুকে জ্বলন্ত কার্বনের গল্প বলে।
নববধূর গয়নায় কতটুকু সোনা, কতটুকু ভেজাল শে গল্পও তারা বলে।
কিন্তু কিভাবে বলে তারা জানতেন না।

বোর তাকিয়ে আছেন দেয়ালের ওই রংধনুর দিকে। তার চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। ওই রেখাগুলোর রহস্য তিনি ভেদ করেছেন।
প্রকৃতির ভাষা তার কাছে ফিলিপ্স বাতির মতো ক্লিয়ার হয়ে গেছে।
ওই রেখাগুলো বোরের $E = hf$ এর গল্প বলছে।
ইলেকট্রন যখন শক্তি শোষণ করে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাচ্ছে, একটা করে দাগ রেখে যাচ্ছে।
ওই দাগের কম্পাঙ্ক হবে শক্তির পার্থক্য ভাগ h.

বোর কক্ষপথগুলোর শক্তি হিসাব করেছেন। সেখান থেকে বের করে এনেছেন কোন শক্তি স্তর থেকে কোথায় গেলে কম্পাঙ্ক কি হবে। কম্পাঙ্ক জানার পর বের হয়ে আসছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য।
প্রথম শক্তি স্তর n1, দ্বিতীয় শক্তি স্তর n2 হলে,
রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য λহলে

$$\frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2})$$

পরমাণুকে সাদা আলো খাওয়ানো হচ্ছে। ওই সাদা আলোতে সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো থাকে।
মনে করি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ থেকে ১০।
ওই পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো সেখান থেকে ৪ আর ৭ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো খেয়ে উপরে উঠছে। বাকি আলো তারা ছুয়েও দেখছে না। E = hf.
f না মিললে, ফালতু আলো তাদের দরকার নেই।
৪ আর ৭ খাওয়া হয়ে গেল, বাকি পড়ে থাকলো ১ ২ ৩ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০।
ওই সংখ্যাগুলো ওই মৌলের নাম আর পরিচয়।
শুধু পরিচয়ই না, ওরা বলে, ওই মৌলের কোন কক্ষপথে কয়টা ইলেকট্রন আছে।

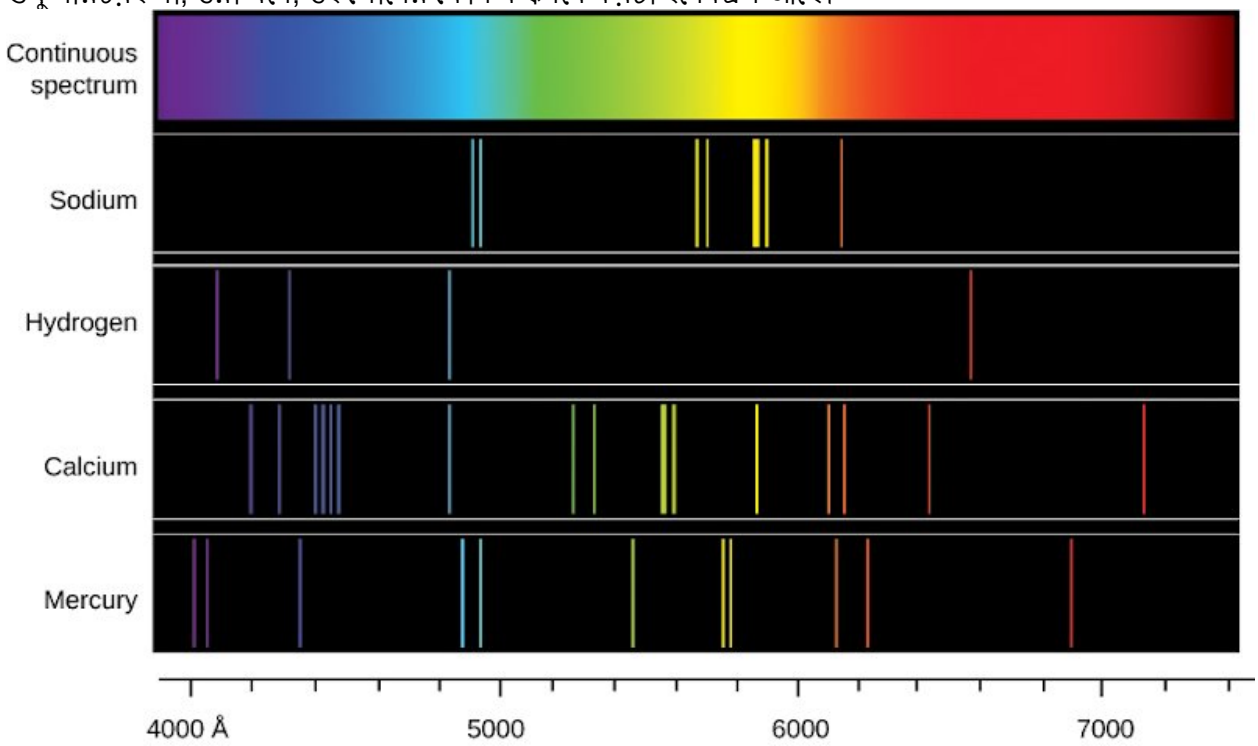

৩।
একের পর এক মৌল হাতে আসলো। বোর হিসাব মেলালেন। বোরের জোড়াতালি দেওয়া পরমাণুর মডেল হাইড্রোজেন ছেড়ে আরও অনেকদূর গেল।
বোর বুঝলেন, হাইড্রোজেনে আর হিলিয়ামে আছে ১টা স্তর।
লিথিয়ামে ২টা।
বোর দেখলেন, যেসব মৌলের বাইরে ৮টা করে ইলেকট্রন থাকে তারা সহজে ইলেকট্রন দিতে নিতে চায় না।
সোডিয়ামের বাইরে ১টা ইলেকট্রন আছে, ওই ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে তার বাইরের লেয়ারে ৮টা ইলেকট্রন হবে। সোডিয়াম ওই ইলেকট্রন তাই ছেড়ে দিবে।
ক্লোরিনের দরকার একটা ইলেকট্রন। সে ওইটা গ্রহণ করবে। তারও বাইরে হবে ৮টা ইলেকট্রন।
কেন জানি সবাই ৮ সংখ্যাটা খুব পছন্দ করে!

৪।
১৯২২ সাল।
জার্মানির গটিনজেনে একটা উৎসব হলো, তার নাম বোর ফেস্টিভ্যাল।
প্রফেসর বোর পুরো পর্যায় সারণি হাতে নিয়ে আসলেন। ব্যাখ্যা করলেন কোন মৌল কিভাবে কাজ করে।
বোঝালেন কিভাবে ২ ৮ ১৮ ৩২ এর নিয়ম মেনে একের পর এক শেল পূর্ণ হয়।
বুঝালেন ঠিক কিভাবে ১টা কার্বন আর ৪টা হাইড্রোজেন মিলে মিথেন অণুর জন্ম হয়।
পর্যায় সারণিতে যে ফাঁকা জায়গা ছিল, সেখানে কে কে বসবে আর তারা কিরকম আচরণ করবে বোর নিখুঁত হিসাব দিলেন!

উপস্থিত বাঘা বাঘা প্রফেসরদের মুখ হা হয়ে গেল। কেউ প্রশ্ন করতেও ভুলে গেল, কেন এই ২ ৮ ১৮ ৩২ এর নিয়ম কাজ করে!

৫।
নীলস বোর প্রায় কোনকিছু না জেনে, বর্ণালির রেখা দেখে পুরো পর্যায় সারণির রহস্য ভেদ করে ফেলেছেন।
আজকে বোরের মডেলের ঝামেলাগুলো আর বলব না। এই জিনিয়াস মানুষটার জন্য লাল সালাম থাকলো।

১০৭ তম মৌলের নাম বোরিয়াম, প্রফেসর বোরের নামে।

রঙের গল্প

বোরের বর্ণালীর পর রঙের গল্প তো আসবেই।
প্রথমেই প্রশ্নঃ
রঙ আসলে কয়টা? তিনটা? সাতটা? অসংখ্য?
ভাবতে থাকো।

শুরু করে দিচ্ছি, রঙের গল্প।

১।
রঙের গল্প শোনার আগে শুনে আসি আমরা কিভাবে দেখি।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টার কথা মনে আছে? সেই কোয়ান্টার পরে নাম দেওয়া হয় ফোটন।

ইলেকট্রন এক শক্তি স্তর থেকে অন্য শক্তি স্তরে গেলে আলোর ফোটন বের হয়। এই ফোটন চোখে এসে পড়লে রেটিনার রড আর কোন কোষগুলোতে আয়োডিন ঘটিত নানান এক ধরণের বিক্রিয়া হয়। সেখান থেকে এক ধরণের ইলেকট্রিক সিগন্যাল তৈরি হয়। সেটা ব্রেইনের ভিজুয়াল কর্টেক্সে আসলে দেখার অনুভূতি তৈরি হয়।

রেটিনার কোন পজিশনে কয়টা ফোটন এসেছে সেটা থেকে বস্তুর ম্যাপ তৈরি হয়। তুমি তোমার সামনের ছেলেটাকে দেখছেন, তার কারণ তার শরীরের প্রতিটা বিন্দু থেকে গুলির মতো ফোটন বের হচ্ছে। এই প্রতিটা ফোটন তার শরীরে জন্ম হয়েছে। দেয়ালে গুলি পড়লে যেরকম ফুটা ফুটা একটা ছবি তৈরি হতো, ঠিক তেমনি ফোটনগুলো লেন্স দিয়ে তোমার চোখে এসে একটা ছবি তৈরি করে। ছবিটা উলটা থাকে, ব্রেইন এটাকে সোজা করে।

এই পর্যন্ত শুনে অনেকে আঁতকে উঠবে। ফোটন নাকি সূর্যে হয় খালি? ছেলের গা থেকে ফোটন জন্ম হয় মানে কি?

ভালো করে শুনো।
ফোটন সূর্যে চাঁদে অনেক জায়গায় হতে পারে। ছেলের গা থেকেও ইনফ্র্যারেড আলোর ফোটন বের হয়, সেটা আমরা দেখি না। আমরা দেখি অন্য কোন উৎস থেকে আসা প্রতিফলিত আলো। মোমবাতির আলোর ফোটন মোমেই তৈরি হয়, সেটা সূর্য থেকে আসা ফোটন না।

চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, তার মানে এই না যে সে ফোটন বানাতে পারে না। সেখান থেকেও কিছু ইনফ্রারেড আলোর ফোটন বের হয়। তবে বেশিরভাগ ফোটন আসে সূর্য আর পৃথিবী থেকে আসা আলো প্রতিফলিত হয়ে।

চাঁদের কথা থাক। রঙের কথায় আসি। আমরা এতক্ষণ ধরে যে গুলির মতো ফোটনের গল্প করলাম তাতে সুন্দর করে মানুষের ছবি উঠবে ঠিকই, রঙ বলতে কিছু থাকবে না। রঙ তাহলে কোথা থেকে আসে?
ভালো করে শুনো। রঙ বলতে আসলে কিছু নাই।
ফিজিক্সে লাল নীল বলে কিছু নাই।
খালি আছে ফোটন। আর ফোটনের তরঙ্গ রূপ।
আমাদের ব্রেইন আলাদা আলাদা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের, অর্থাৎ আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সির আলোকে আলাদা রঙে দেখে।

পুরো জিনিসটা কল্পনা।
পুরোটাই ব্রেইনে তৈরি।

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক বিশাল রেঞ্জের হয়। বেশিরভাগ আমরা দেখি না। যেটুকু দেখি সেটাকে ব্রেইন নানান রঙে রাঙায়।
ঠিক কিভাবে রাঙায়?
জিনিসটা কিছুটা জটিল। খেয়াল করে পড়তে হবে।

২।
সাদা আলোকে প্রিজমে পাস করলে সেটা অগণিত রঙে ভাগ হয়।
কয়টা রঙে ভাগ হয়?
অসীম।

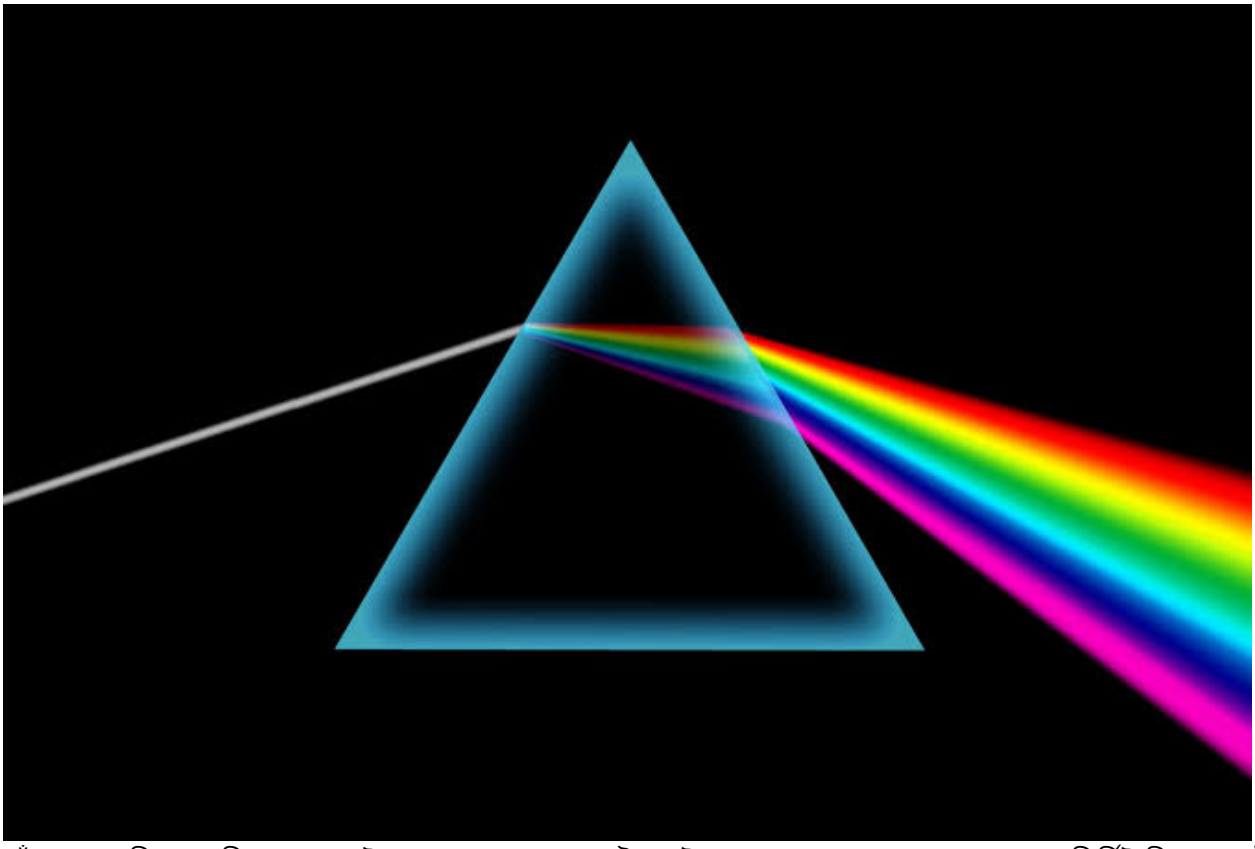

দাঁড়াও, অগণিত হয় কিভাবে? একটু আগে তো বোর বলল ইলেকট্রন এক স্তর থেকে আরেক স্তরে গেলে নির্দিষ্ট কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বের হয়।
ধরলাম, হাইড্রোজেনের রেখা ১০টা।
অক্সিজেনের ২০টা।
সোডিয়ামের ৩০টা।
১১৮টা মৌল আছে। সবার গায়ে গায়ে নাম্বার বসাও। যোগ কর।
কোনভাবে কি অসীম হওয়া সম্ভব?

যদি অসীমই হয়, বোর কি ভুল বলল?

একটু ভাবো।
বাঁচতে হলে ভাবতে হবে।
ক্লুঃ সব ক্ষারই খারক, কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয় ;)

ভাবা শেষ?
ইলেকট্রন এক শক্তি স্তর থেকে অন্য শক্তি স্তরে গেলে আলোর ফোটন বের হয়। সত্যি। কিন্তু এইটা একমাত্র উপায় না।
নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় ফোটন বের হয়। সূর্য সেভাবে আলো দেয়। সেখানে একটা রেঞ্জের মধে সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো থাকে।
কঠিন পদার্থে ধরণের নানান ধরণের অণু পরমাণুর সঙ্ঘর্ষে ফোটন বের হয়।
কৃষ্ণবস্তুর বিকীরণে যে আলো বের হয় তাতে সব ধরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে।

কেবলমাত্র যখন অণু পরমানুগুলো অনেক দূরে দূরে থাকে, যে তাদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি সম্ভব না, তখন আমরা বোরের বর্ণালী পাই।
সূর্যের ভেতরে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া হয়ে সাদা আলো বের হয়। সেখানে সব তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে। এই আলো বাইরের লেয়ারে আসতে আসতে সেখানকার পরমানু দিয়ে শোষিত হয়ে যায়।
তখন আমরা পাই বোরের বর্ণালি।

সাদা আলোর অগণিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য এখন ক্লিয়ার?
গুড। এবার আসি রঙের কথায়।
প্রশ্নঃ রঙ যদি অগণিতই হবে, তাহলে সাত রঙের কাহিনী কি?

আবারও, একটু ভাবো।
বাঁচতে হলে ভাবতে হবে।

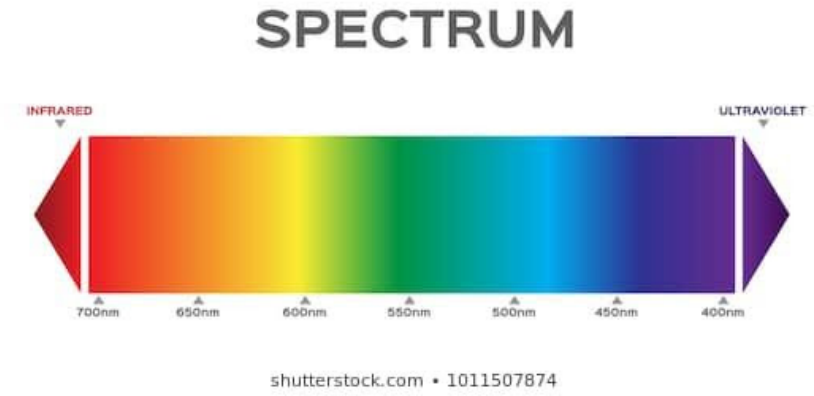

এই অগণিত রঙকে আমরা ১০টা ভাগে ভাগ করতে পারতাম। ৮টা ভাগেও ভাগ করতে পারতাম। ৩০০টা ভাগেও ভাগ করতে পারতাম।
আমরা সাতটা ভাগে ভাগ করেছি। কেন করেছি?
খুশিতে। ঠেলায়। ঘুরতে।
নাম দিতে ভালো লাগে তাই।
ছবিটা খেয়াল করো। অগণিত রঙ। বামে বেগুনী আসতে আসতে চেঞ্জ হয়ে নীল হয়েছে। কোন হুট করে পরিবর্তন নেই।
ঠিক কোন পয়েন্টে বেগুনী থেকে নীল হয়েছে কেউ বলতে পারবে না। সাতটা রঙ কেবলই সাতটা নাম।

এইযে রংধনুর এই অগণিত রঙ, প্রকৃতিতে প্রতিটার আলাদা আলাদা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে।
এই খানে প্রতিটা রঙ মৌলিক।
৬০০-৬৮০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে জায়গাটুকুকে আমরা কমলা বলছি সেটা আসলেই কমলা।
ভালো করে খেয়াল করো।

আকাশে রংধনুর দিকে তাকালে যে কমলা রঙ দেখছেন সেটা লাল আর সবুজের মিশ্রণ নয়।
সেটা 'বিশুদ্ধ' কমলা।
শুধু কমলা কেন, রংধনুর সবগুলো রঙ এক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের। তিন চারটা আলো মিলে তৈরি হয় নি।

আকাশে রংধনুর রঙগুলো লাল, নীল আর সবুজ এই তিনটা রঙের সমষ্টি না। এগুলো বিশুদ্ধ রঙ।

৩।
তাই যদি হয়, তাহলে মৌলিক রঙ আসলে কি জিনিস?
এইবার খেয়াল করো।
যে রঙটাকে আমরা কমলা বলি, সেটা হতে পারে ৬৫০ ন্যানোমিটারের বিশুদ্ধ আলো।
হতে পারে লাল আর সবুজ আলোর মিশ্রণ।

কমলা = ৬৫০ nm
কমলা = ৭০০ nm + ৫৫০ nm

আমাদের ব্রেইনে ৬৫০ nm আলো ঢুকলে যে অনুভূতি হয়, পাশাপাশি একটা ৭০০ nm আর ৫৫০ nm এর আলো ঢুকলেও একই অনুভূতি হয়। আমরা দুটাকেই কমলা মনে করি।

তার মানে, সব ৬৫০ nm ই কমলা, কিন্তু সব কমলাই ৬৫০ nm নয়।

কমলাকে আমরা রংধনুকে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু অনেক রঙ আছে যেগুলোকে রংধনুতে পাওয়া যাবে না। যেমন ম্যাজেন্টা। যেমন সাদা আলো।
সাদা আলো তৈরি হয় অনেকগুলো রঙ মিলে। ম্যাজেন্টাও সেরকম, অনেক রঙ মিলে তৈরি।

তার মানে, রংধনুতে যদিও কোটি কোটি রঙ আছে, এগুলোই সব নয়। এর বাইরেও অনেক রঙ আছে।

একটা রঙ অনেকভাবে তৈরি হতে পারে।
সাদা = বেগুনী + নীল + আসমানি + সবুজ + হলুদ + কমলা + লাল
সাদা = নীল + লাল + সবুজ
কোন রঙ কত পরিমাণে মিশেছে সেটা ম্যাটার করে।
আবার রঙগুলো মিলে মিশে সম্পূর্ণ নতুন রঙ তৈরি হতে পারে যেটা আসলে ছিলই না।

তাই যদি হয়, তাহলে লাল নীল সবুজ মৌলিক রঙ আসলো কিভাবে?
উত্তরটা আমাদের চোখে।

৪।
আমাদের চোখের রেটিনায় তিন ধরণের কোণ কোষ আছে।
একগুলো বর্নালিতে লালের দিকের রঙগুলো সেন্স করে বেশি।
খেয়াল করো। লালের দিকের বলেছি। একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নয়।
আরেকগুলো সবুজের দিকের রঙ সেন্স করে। বাকিগুলো নীলের দিকের।

একটু আগে কমলার কথা বলেছিলাম মনে আছে?
চোখের কাছাকাছি দুইটা কোন কোষ যদি একটা লাল একটা সবুজ দেখে ব্রেইন সেটাকে কমলা ধরে।
আবার বিশুদ্ধ কমলা দিলেও ব্রেইন সেটাকে কমলাই ধরে।
একেবারে কি সেইম রঙ ধরে?
নাও হতে পারে। কাছাকাছি হতে পারে।

শুধু কমলা নয়, অন্য বেশিরভাগ রঙ এভাবে নিশুদ্ধ লাল নীল সবুজের নানান কম্বিনেশন মিলিয়ে তৈরি করা যায়।
মনিটর এভাবে কাজ করে।
মনিটরে পাশাপাশি থাকে একটা লাল, একটা নীল, দুইটা সবুজ পিক্সেল।
এগুলো একেকটা একেক উজ্জ্বলতার আলো দেয়।
এগুলো মিক্স হয়ে চোখ নানান রঙ দেখে।

যদি পাশাপাশি দুইটা কোন কোষে ৭০০ ন্যানোমিটারের (লাল) ৩৩ ভাগ ফোটন, আর ৫৫০ ন্যানোমিটারের (সবুজ) ৩৩ ভাগ ভাগ ফোটন ঢুকে আমরা ক্যাটক্যাটা হলুদ রঙ দেখব।
তিনটাই সমান পরিমাণে ঢুকলে দেখব সাদা রঙ।

এইভাবে লাল নীল সবুজ মিশিয়ে অনেক রঙ তৈরি করা যায়। যদিও সব না।
প্রকৃতির হাজার হাজার রঙের মিশ্রণ তাই মনিটরের তিন রঙের ধোঁকাবাজির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।

তাহলে মৌলিক রঙ আসলে কি?
মৌলিক রঙ আমাদের মানসিক জিনিস। প্রাকৃতিক নয়।

৫।
মানুষের ব্রেইন খুবই কমপ্লেক্স জিনিষ। তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক থাকলেও সে আশেপাশের আলো ছায়র সাথে মিলিয়ে, আরো অনেক কিছু দেখে

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

নানান রকমের রঙ তৈরি করতে পারে।
একটু ভাবো, মানুষের চোখে আছে মাত্র তিন ধরণের আলোর রিসেপ্টর।
অনেক প্রাণি আছে যাদের রিসেপ্টর ৫-৬ ধরণের।
ম্যান্টিস শ্রিম্পের নাকি বারো রকমের।
তাদের দুনিয়া কি আসলেই আমাদের মতো রঙ্গিন? নাকি তাদের ব্রেইন অতো পাওয়ারফুল নয়?
মৌমাছি নাকি আল্ট্রাভায়োলেট আলো দেখতে পারে।
কোনদিন ভেবেছ কি, তুমি যদি আল্ট্রাভায়োলেট আলো দেখতে পারতে, সেটা কি রঙে দেখতে? সেটার অনুভূতি ঠিক কেমন হতো?

চিন্তা করতে হবে।

চক্ষু থাকিতে অন্ধ যারা আলোকের দুনিয়ায়
সিন্ধু সেচিয়ো বিষ পায় তারা অমৃত নাহি পায়!

সমারফিল্ডের মডেল

১।
অনেকক্ষণ বোরের মডেলের গুণগান গেয়েছি, এবার কিছু কথা বলা দরকার।

আকাশ থেকে পাওয়া অলৌকিক পাথর দিয়ে ভালভাবে না বুঝে শুনে বাড়ি তৈরি করলে সেই বাড়ি বেশিদিন টিকে না। বোর কেবলমাত্র পরীক্ষার সাথে মেলানোর জন্য আকাশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন $mvR = nh/2\pi$। সেই জিনিস হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে অনেকদূর ঠিক ছিল, জটিলতা বাড়ার সাথে সাথে তার কদাকার রূপটা বের হতে থাকে।
সৌরজগতে গ্রহগুলো একে অপরকে আকর্ষণ করে, ইলেকট্রনগুলো করে বিকর্ষণ। এক কক্ষপথে একটাই গ্রহ থাকে, হিসাব মেলানোর জন্য এক কক্ষপথে আসতে লাগল ২টা, আটটা, আঠারোটা করে ইলেকট্রন। কেন এই ২, ২, ১৮র নিয়ম তার কোন ব্যাখ্যা বোরের কাছে ছিল না, উলটা এতগুলো ইলেক্ট্রনের বিকর্ষণ বোরের হিসাবকে তছনছ করে দিতে লাগলো। হিসাব মেলানোর জন্য বোর ধরে নিলেন কক্ষপথের ইলেকট্রন বিকর্ষণ করে না, ঠিক যেমন তিনি ধরে নিয়েছিলেন একটা কক্ষপথে থাকার সময় ইলেকট্রন বিকীরণ করে না।

ঝামেলা আরো বাড়লো। ইলেকট্রন এক স্তর থেকে আরেক স্তরে লাফিয়ে গেলে যে আলো বের হয় তার কম্পাংক হয় ওই দুই স্তরের শক্তির পার্থক্যের সমাণুপাতিক, মনে আছে?
এক স্তরের শক্তি E1, আরেক স্তরের E2 হলে, $\Delta E = E1 - E2 = hf$ হবে।
কম্পাঙ্ক হবে একটা, f.
বর্ণালীতে রেখা পড়বে একটা।

কয়েকদিন পর দেখা গেলো, রেখা আসলে একটা না, কয়েকটা,। খুব ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পরে একটা রেখা আসলে কয়েকটা সূক্ষ্ম রেখা তৈরি!

বোরের জোড়াতালি দাওয়া মডেলকে আরো কিছুদিন টিকিয়ে রাখার জন্য আসলেন প্রফেসর সমারফিল্ড। চলো দেখে আসি সমারফিল্ডের কি বলার আছে।

২।
সমারফেল্ড বললেন, বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রনকে ঘুরতে হবে এমন কোন কথা নেই।
পৃথিবী উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে। মঙ্গল উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে।
উপবৃত্তাকার পথ ডিমের মতো। ডিম জিনিসটাকে সবাই খুব পছন্দ করে।
ইলেকট্রনও ডিমের মতো পথে ঘুরে।
বোরের একেকটা শক্তিস্তরের জায়গা দখল করলো কয়েকটা করে নানান সাইজের ডিমের মতো স্তর।
প্রথম কক্ষপথ n = 1. n = 1 এর জন্য আগে একটা গোল কক্ষপথ ছিল, এখনো তাই আছে।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

n = 2 এর বদলে আসলো দুইটা কক্ষপথ। একটা গোল আরেকটা ডিমের মতো।
n = 3 এর জন্য আসলো তিনটা। গোল, ডিমের মতো, আর বেগুনের মতো।
জন্ম হলো নতুন কোয়ান্টাম নাম্বারের, l.
n এর কোন একটা মানের জন্য n টা l পাওয়া যায়।
এগুলোর মান 0 থেকে n - 1 পর্যন্ত।

তো, ডিমের মতো, বেগুনের মতো নানান সাইজের কক্ষপথ পেয়ে ইলেকট্রন মহানন্দে সেখানে ঘুরাঘুরি করতে লাগলো।
ধরো, কয়েকটা ইলেকট্রনের n একই l শক্তির পরিমাণও কাছাকাছি। কিন্তু একই nবিশিষ্ট েকেক ইলেকট্রন একেক বেগে দৌড়ায়। কারো কারো বেগ খুব বেশি। স্পিড খুব বেশি হলে কি হবে? ভর বাড়বে। যেই কক্ষপথটা বেশি বেগুনের মতো ওই কক্ষপথে ইলেকট্রন একসময় নিউক্লিয়াসের বেশি কাছে দিয়ে যাবে। তখন ওই ইলেকট্রনটার ভর, কাছাকাছি শক্তির অন্য রাস্তায় চলা ইলেকট্রনদের চেয়ে একটু বেশি হবে। নিউক্লিয়াসে পড়া এড়াতে হলে তাকে বেশি বেগে যেতে হবে। ভর একটু বেশি হলে শক্তিও একটু বেশি হবে। ওই ইলেকট্রনটা যখন লাফ দিয়ে অন্য স্তরে যাবে, শক্তির পার্থক্য একটু এদিক ওদিক হবে।
আগে একটা E = hf পাওয়া যেত, এখন কয়েক রকমের E = hf পাওয়া যাবে।

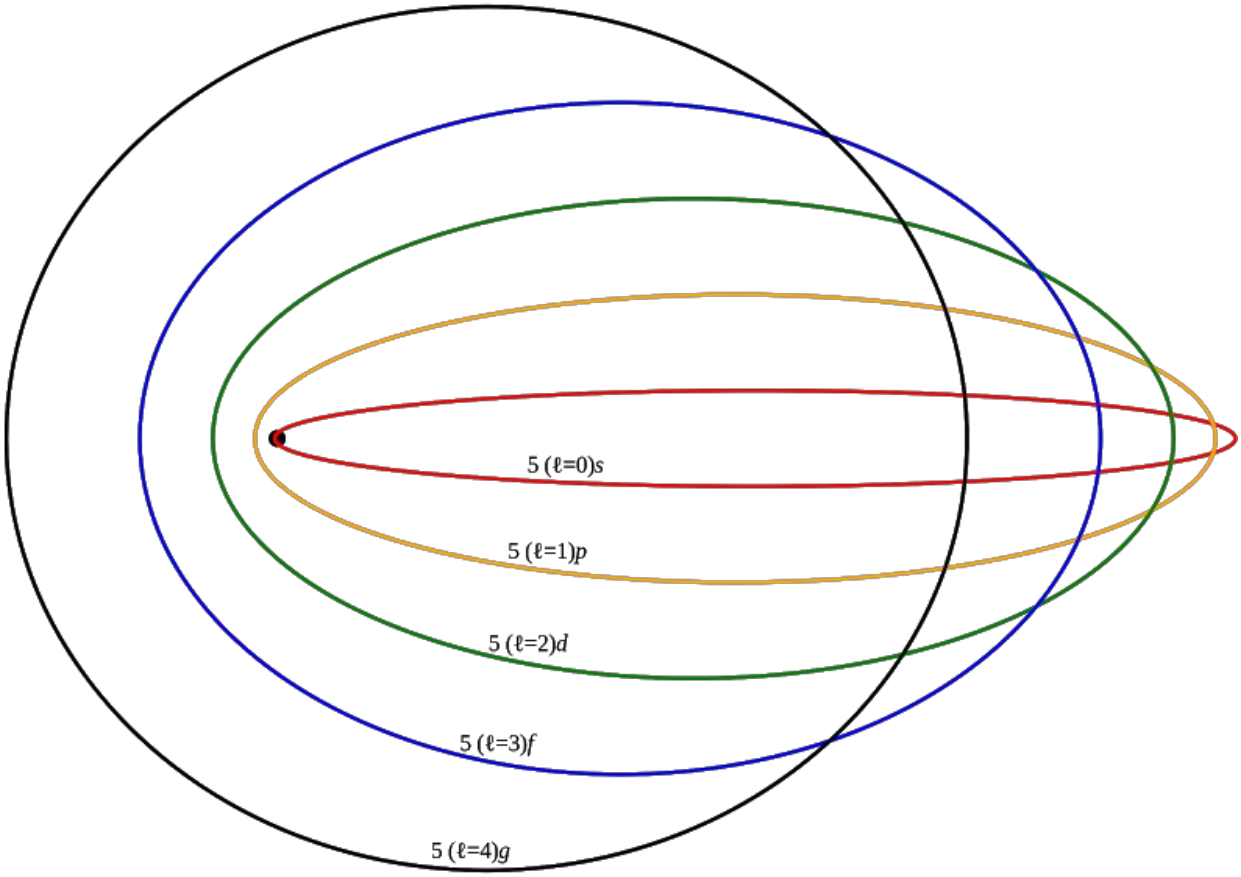

হিসাব মিলল কি?

৩।
কয়েকদিন পর আবার যন্ত্রণা শুরু হলো। জিম্যান নামে এক ঘারতেড়া বিজ্ঞানী ওই রেখাগুলোকে চুম্বক ক্ষেত্রে বসিয়ে দেখলেন, ফাজিলগুলো আবারও কয়েকটা রেখায় আলাদা হয়ে গেছে।
বোর মহা যন্ত্রণায় পড়লেন। এতো ঝামেলা করতে কে বলেছিল এদের?! কি দরকার ছিল এত চুম্বক নিয়ে টানাটানি করার!

আবারও রেস্কিউতে আসলেন সমারফেল্ড। বললেন, এই জিনিস হয় কারণ কক্ষপথগুলো একেকটা একেক তলে আছে। কোনটা XY বরাবর, কোনটা YZ. চুম্বক ক্ষেত্রে আনলে যেই তলটা চুম্বক ক্ষেত্রের দিকের কাছাকাছি আছে তার শক্তি একরকম হয়, দূরের গুলোর শক্তি অন্য রকম হয়।

আরেকটা কোয়ান্টাম নাম্বারের জন্ম হলো। ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার m.
m এর মান -l থেকে l পর্যন্ত।
l = 0 হলে ইলেকট্রন একটা তলে ঘুরে। m = 0.
l = 1 হলে ইলেকট্রন ৩টা তলে ঘুরে। ৩ রকম কোন করে। m = -1, 0, 1
l = 2 হলে ৫টা তল। m = -2, -1, 0, 1, 2 . ক্লিয়ার?

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

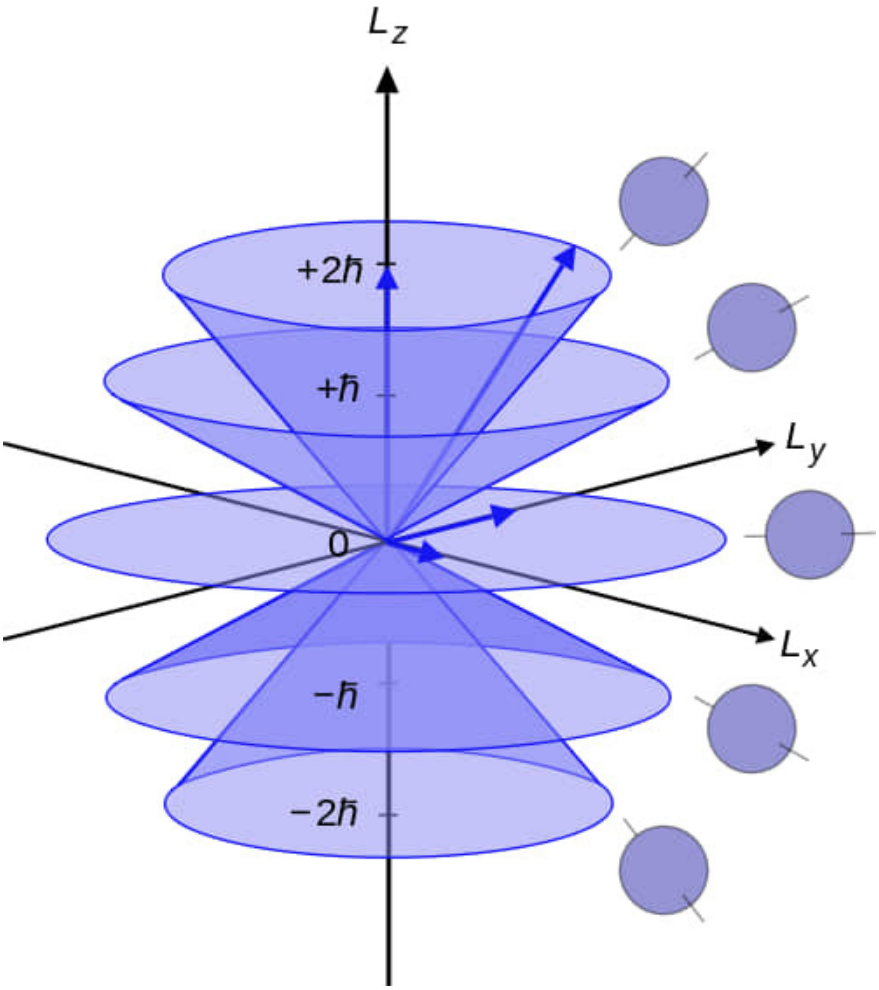

৪।
শেষ পর্যন্ত বোরের সিম্পল মডেল অনেক উপবৃত্তাকার পথে ভাগ হয়ে গেল। সেগুলো আবার ভাগ হল অনেক তলে।
সমারফিল্ড জটিলতা কমালেন না, বরং বাড়ালেন। ২য় আর ৩য় কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলো আনার জন্য তাঁর সমীকরণে হাজারটা approximate জিনিস ধরা হলো।
শেষ পর্যন্ত ইলেক্ট্রন ভাগ হয়ে গেল ছোট ছোট অর্বিটালে। একই অর্বিটালে জায়গা হলো মাত্র দুইটা ইলেকট্রনের।

বিজ্ঞানী অটো স্টার্ন বোরের মডেলের ঘোর বিরোধী। তিনি খুবই সিরিয়াস টাইপের নো ননসেন্স বিজ্ঞানী।
তাঁর সাথে সমসময় একটা হাতুড়ি থাকে। যন্ত্রপাতি কথা না শুনলে হাতুড়ি দিয়ে ভয় দেখান।
স্টার্ন এবার রেডি হলেন বোরের মডেলকে ব্রেক করার জন্য। সাথে তাঁর সহকারী গার্ল্যাক।

অটো স্টার্ন হাতুড়ির বাড়ি মারলেন। ভেঙ্গে গেলো প্যান্ডোরার বাক্স। বের হয়ে আসলো দানব!

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

স্পিন: কি এই জিনিস?

১।
স্টার্নের স্বপ্ন (কাল্পনিক):

অটো স্টার্ন এখন মহাকাশচারী, তাকে পাঠানো হয়েছে নতুন এক সৌরজগতে। উদ্ভট কিছু একটা হয়েছে এখানে, কেউ ঠিকমত ধরতে পারছে না।

স্টার্ন ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এই ওই গ্রহে নামলেন। খটকা লাগাটা আরো বারলো।
কি এক অদ্ভুট কারণে সবগুলো গ্রহ একই রকম দেখতে। হুবহু একই রকম।
তাঁর চেয়ে বড় কথা, কি কারণে জানি সবগুলো একই অক্ষ বড়াবর ঘুরছে। Z অক্ষ বরাবর।

আমাদের চেনা সৌরজগতে যেমন একেক গ্রহ একেক দিকে কোন করে ঘুরছে, এটা সেরকম নয়। সবগুলো গ্রহ একেবারে Z অক্ষের দিকে লেগে ঘুরছে। কেউ গড়ির কাটার দিকে, কেউ উলটা দিকে।

প্রত্যেকের গতি হুবহু এক। দিন রাত্রি সমান। খালি কেউ উপরে মুখ করে আছে, কেউ নিচে।

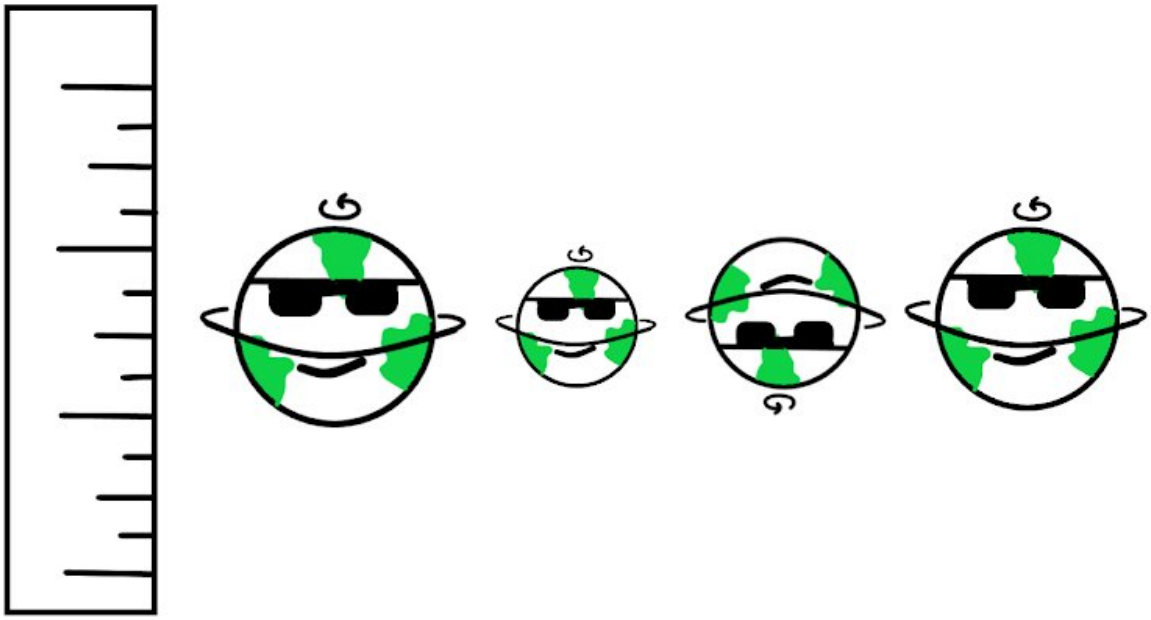

একটু পরে ঝামেলা আরও বাড়লো। তাঁর সঙ্গী গারল্যাক দাবী করল, সব গুলো গ্রহ কি কারণে জানি Z অক্ষের সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোণ বরাবর যে অক্ষ , সেটার চারপাশে ঘুরছে।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

স্টার্ন প্রথমে কিছুতেই মারতে চাইলেন না। একটু আগেই তিনি মেপে দেখেছেন এরা সবাই Z অক্ষের চারপাশে ঘুরে। ৪৫ ডিগ্রি অসম্ভব। দুই একবার তাঁর হাতুড়িটা বের করা জন্যও তাঁর হাত নিশপিশ করে উঠলো।

শেষে গারল্যাক একেবারে যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে প্রমাণ করে দেখালেন, এরা সবাই এখন আসলেই Z অক্ষের সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে ঘুরছে।

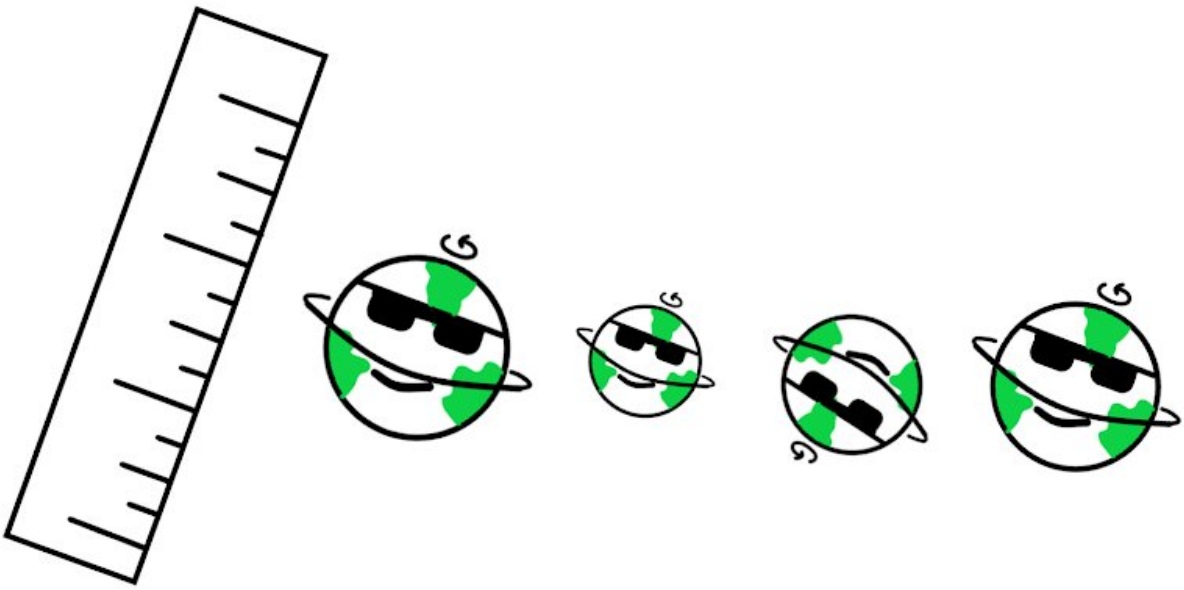

মাথা নষ্ট অবস্থা। কিভাবে হলো এটা? একটু আগেই না এরা Z অক্ষ বরাবর ঘুরছিল? এখন অন্য অক্ষে গেল কেমন করে?

কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। ঘুরাঘুরি মাপার মেশিনগুলো ঠিকমত কাজ করছে না মনে হয়। বার বার বলেছিলেন ধোলাইখাল থেকে ব্যাকাপ পার্টস নিয়ে আসতে। কে শোনে কার কথা!

মেশিনপথ ঘষামাজা করে আবার মাঠে, সরি, গ্রহে নেমে পড়লেন। এইবার আরেকটু বুদ্ধি করতে হবে। হয়তো আগে হিসাবে কোন ভুল হয়েছিলো। আসলে এরা হয়তো Z অক্ষ বরাবরই ঘুরে, গারল্যাক ভুলে ৪৫ ডিগ্রি কোণ বরবর এদের উপাংশ নিয়েছেন মাত্র। তাই যদি হয়, X অক্ষ বরাবর এদের তো কোন উপাংশ থাকবে না। থাকবে?

স্টার্ন আর গারল্যাক মাপলেন। আরো নিখুঁতভাবে। এবার তারা মাপলেন X অক্ষ বরাবর?

কি হলো আন্দাজ করতে পারো?
রাইট। এইবার সবগুলো গ্রহকে দেখা গেলো মনের আনন্দে X অক্ষ বরাবর ঘুরছে!

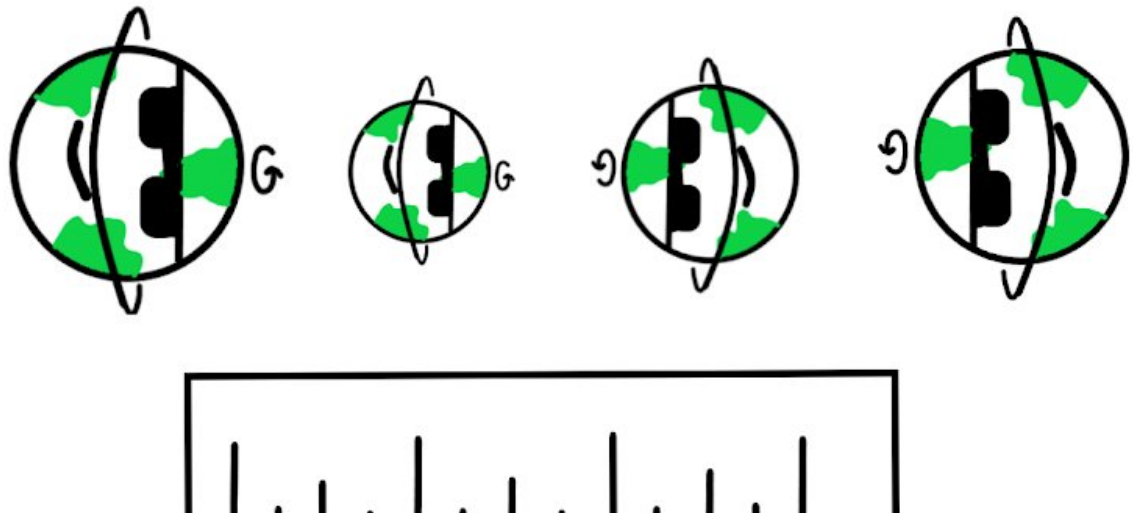

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

স্টার্ন আর গারল্যাক মাপলেন। নানা দিক থেকে, নানান কোণ করে। কোন ভুল নাই। যেদিকেই মাপেন, গ্রহগুলো কিভাবে জানি ওই অক্ষ বরাবর দাঁড়িয়ে ঘুরা শুরু করে দেয়!

গ্রহগুলোর ঘুরাঘুরি দেখে স্টার্নের মাথা ঘুরতে লাগলো। তাঁর মনে একটা সন্দেহ দানা বেধেছে। ভয়ংকর এক সন্দেহ।
কেউ যখন দেখে না, তখন গ্রহ কোনদিকে ঘুরে?

২।
প্রফেসর স্টার্ন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তিনি একটা স্বপ দেখেছেন।
ঠিক দুঃস্বপ্ন না, কিন্তু তাঁর পরও মনটা খচখচ করছে।
কি জানি ছিল স্বপ্নটায়, দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়ংকর! ঠিক মানতে পারছেন না।
স্বপ্নের শেষটা তাঁর কিছুতেই মনে পড়ছে না।

কিছুক্ষণ দুঃস্বপ্নের কারণ নিয়ে ভাবলেন। বদহজম হয়েছে কি?
ডাক্তার দুই বেলা ইসব কুলের ভূষি রেকমেন্ড করেছিল, দুই দিন খেয়ে এভাবে বাদ দেওা উচিত হয় নি। পেট ঠিক রাখাটা জরুরী, পেট ভালো তো দুনিয়া ভালো।

হঠাত তাঁর মনে পড়লো বিকালের পরীক্ষাটার কথা। মনে পড়তেই পেট মোচড় দিয়ে উঠলো। সামান্য একটা পরীক্ষা, কিন্তু তার ফল কতো ভয়াবহ!

একটু খেয়াল করে পড়ো। শুরু করছি, স্টার্ন গার্ল্যাক এক্সপেরিমেন্ট।

৩।
কয়েকটা পয়েন্ট, মন দিয়ে পড়ঃ
ফিজিক্সের বেসিক নিয়মগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে কৌনিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকবে। ঠিক যেমন, ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, কৌনিক ভরবেগ সংরক্ষিত রাখার একটাই উপায়, ইলেকট্রনকে অবশ্যই নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরতে হবে। এর নাম দেওয়া হয়েছে স্পিন।

যে আধান ঘুরে সেটা একটা চুম্বক।
সেটার থাকে দুইটা মেরু। উত্তর আর দক্ষিণ। উপরের দিকে উত্তর, নিচের দিকে দক্ষিণ।

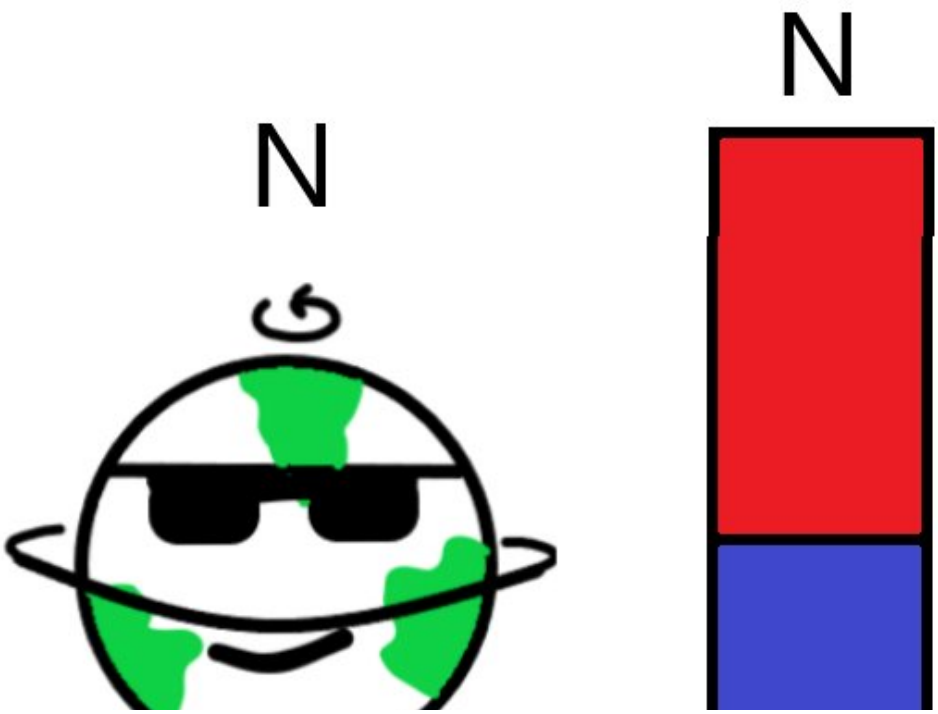

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

তাই যদি হয়, তাহলে চুম্বক ইলেকট্রনকে টানবে।

ইলেক্ট্রন যে অক্ষ বরাবর ঘুরে সেটার উপরের দিকে হচ্ছে উত্তর মেরু, আর নিচের দিকে দক্ষিণ। প্রশ্ন হচ্ছে, কি সেই অক্ষ?

এমন কোন কারণ আছে কি, এক খন্ড লোহার টুকরার সব ইলেকট্রন একদিকে মুখ করে ঘুরবে?

না নেই, প্রথমে ধরে নেই একেকটা একেক দিকে ঘুরে।

এইবার ধরি, দুইটা চুম্বক বসানো আছে। উপরের দিকে আছে একটা চুম্বকের দক্ষিণ মেরু, নিচের দিকে উত্তর মেরু। দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এই বিশেষ চুম্বকের।

এবার যদি ওই দুই চুম্বকের মাঝখান দিয়ে অনেকগুলো ইলেকট্রন ছুড়ে মারি, কি হবে?

- যাদের N উপরের দিকে তারা উপরে যাবে বড় চুম্বকের S এর টানে।
- যাদের S উপরের দিকে তারা নিচে যাবে বড় চুম্বকের S এর ধাক্কায়। বড় চুম্বকের N নিচ থেকে বাঁধা দিবে, কিন্তু তবু এরা শক্তিশালী S এর ধাক্কায় নিচের দিকে যাবে।
- যারা সরাসরি উপরের দিকেও না, নিচের দিকেও না, তারা কোণ অনুযায়ী মাঝ বরাবর থাকবে কোথাও।

স্টার্ন আর গারল্যাক ছুড়ে মারলেন ইলেকট্রন বিম। দুই মেরুর মাঝাখান দিয়ে গেল তারা।
অর্ধেক গেলো উপরে, অর্ধেক গেলো নিচে। মাঝামাঝি জায়গায় একটাও গেলো না।
ঠিক যেন সবাই উপরে বা নিচে যাওয়ার জন্য লাইন ধরে আছে!

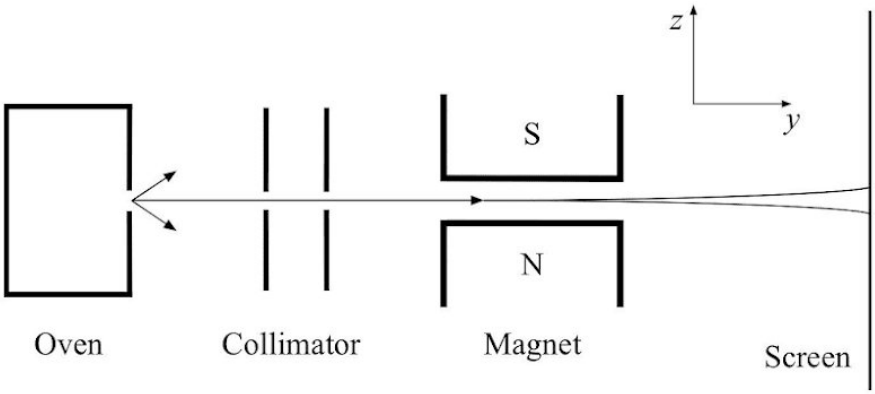

স্টার্ন গারল্যাক তাদের মেশিনকে নানা কোণে ঘুরালেন। নানান ভাবে মাপলেন।
যেদিকেই ঘুরান না কেন, ইলেকট্রন সব সময়ই কেউ পুরোপুরি উপরের দিকে যায়, কেউ পুরোপুরি নিচের দিকে যায়।

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

তার মানে, যে অক্ষের সাপেক্ষেই মাপো না কেন, ইলেক্টনের স্পিন সব সময় দুইটা।

সিদ্ধান্তঃ
স্টার্নের স্বপ্নের সেই গ্রহগুলোর মত, ইলেকট্রন আগে থেকে জানে না তার কোন দিক দিয়ে ঘুরা উচিত। মাপতে গেলে সে দিক ঠিক করে।
তাহলে, মাপার আগে সে কোন দিকে ঘুরে? কোনদিকে ঘুরে কি?
ঘুরতে কিন্তু তাকে হবেই, না হলে যে কৌনিক ভরবেগের সূত্র ভঙ্গ করবে।

৩।
স্টার্ন স্বপ্নের বাকি অংশটা ভুলে গেছেন। যদি মনে পড়ত, তাঁর অস্বস্তি আরো কয়েক গুণ বাড়তো।

ধরো তুমি একটা গ্রহের দিকে তাকিয়ে আছো। ওই গ্রহের ঢাকা শহরের দিকে।
গ্রহটা যখন ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে আবার আগে জায়গায় আসবে, তখন তোমার সামনে আবার ঢাকা শহর ব্যাক করা উচিত, তাই নয় কি?

সেটা হয় না। ঘুরে আসার পর তুমি দেখবে তোমার সামনে সম্পূর্ণ নতুন এক শহর।

স্টার্ন স্বপ্নের মধ্যে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে আসার পর ঢাকা শহর ব্যাক করে নি। তাঁর সামনে ভেসে উঠেছে কোহকাফ নগরী।

৭২০ ডিগ্রি অর্থাৎ দুই পাক ঘুরে আসার পর আবার কিভাবে যেন ফিরে এসেছে ঢাকা শহর।

স্টার্ন গ্রহের ঘুর্নন বেগ ভালোভাবে মাপতে পারেন নি। ধোলাইখালের পার্টস টা বড্ড দরকার ছিলো।
যদি মাপতে পারতেন তাহলে বুঝতেন ঘুরার বেগ আসলে আলোর বেগের চেয়ে বেশি।

৪।
স্পিনের মান দিয়ে আসলে বুঝায় কণার কৌণিক বেগের মান কত।
ব্যাপারটা এরকমঃ
যে কণাকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরালে তারা আগের অবস্থায় ফিরে আসে, তাদের স্পিন হচ্ছে দুই। কারণ প্রতি ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরতে তারা দুইবার একই অবস্থায় আসবে। আবার যে কণাকে ১২০ ডিগ্রি ঘুরালে আগের অবস্থায় আসে তাদের স্পিন হচ্ছে ৩। কারণ প্রতি ৩৬০ ঘুরতে তারা ৩৬০/১২০ = ৩বার একই অবস্থায় আসে।

এর উদাহরণ হতে পারে তাসের কার্ড। তাসের রানিকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরালেই তাকে আগের অবস্থায় দেখি, রানির তাই স্পিন হচ্ছে ২। আর হার্টকে পুরো ৩৬০ ডিগ্রি না ঘুরালে আগের অবস্থায় দেখা যায় না, তাই এদের স্পিন ১। ফোটনের স্পিন হচ্ছে ১। অনেক

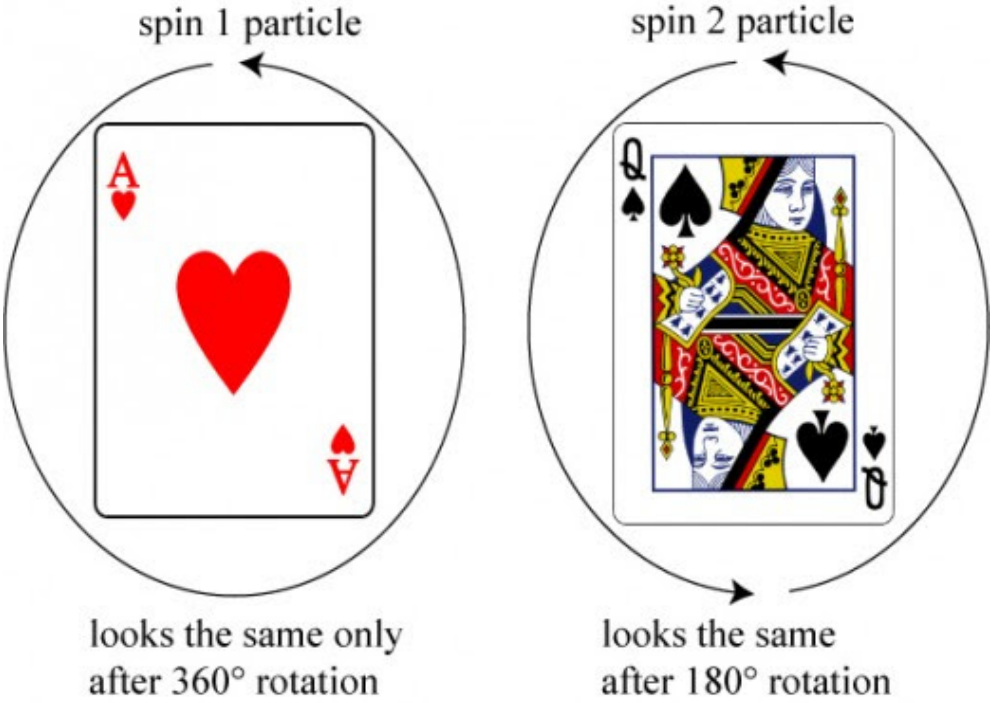

কম্পোজিট কণার স্পিন ২, ৩ থাকে।

স্পিন ০ বলতে বুঝায় গোল কণা, যারা সব সময় আগের অবস্থায়ই থাকে।

ইলেকট্রনে, কোয়ার্ক এদের স্পিন ১/২। ঘড়ির কাটার উলটা দিকে ঘুরলে ১/২, ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরলে -১/২। যেকোন অক্ষের

#1Best PDF Download Site ~ www.purepdfbook.com

সাপেক্ষে। তার মানে, এদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ৭২০ ডিগ্রি ঘুরাতে হবে। আমি দুঃখিত, এই ধরণের কোন সরল ছবি দেওয়া সম্ভব না। উইকিপিডিয়ায় একটা স্পিন ১/২ মেশিনের ছবি দিয়েছে, লিঙ্ককে যেয়ে সেটার অ্যানিমেশান দেখে আসো। কিউ আর কোড স্ক্যান করে নিও।

SCAN ME

https://en.wikipedia.org/wiki/Spin-%C2%BD#/media/File:Spin_One-Half_(Slow).gif

আমরা সামনে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ডিপে যখন দেখবো, তখন বুঝবো এই ছবিগুলো আসলে ঠিক না। মৌলিক কণা যদি সত্যি সত্যি নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরত, এই ঘুর্ননের বেগ হতো আলোর বেগের চেয়ে বেশি। তারপর, যেকোন অক্ষের সাপেক্ষে মাপলেই সে হয় +১/২ অথবা -১/২ বেগে ঘুরছে, এটা থেকেও বুঝা যায়, কণা কিন্তু ঠিক আমাদের পরিচিত সলিড মার্বেল টাইপ জিনিস না। একটা সহজ স্বাভাবিক মার্বেল কখনোই এই ভয়ঙ্কর কাজ করবে না। স্পিনকে তাই ধরা হয় ভর, চার্জ টাইপের একটা ধর্ম - এই ধর্মের কারণে কণার চুম্বকত্ব আসে, কৌণিক ভরবেগ যোগ হয়, কিন্তু এটা আসলে কি, কেউ জানে না।
আচ্ছা, চার্জ আসলে কি, তুমি কি জান? আমরা তো শুধু জানি চার্জের জন্য আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয়। স্পিনও সেরকম। বহুদিন আগে যখন কণাকে মানুষ সলিড বল টাইপের কিছু ভাবতো, তখন স্পিন নামটার জন্ম হয়েছিল। এই নাম না দিয়ে এর নাম ডিডিম, কিটিম, হাম্পটি ডাম্পটি দিলে হয়তো আরো ভাল হতো, কেউ পরিচিত কিছুর সাথে একে মেলানোর চেষ্টা করতো না।

কণা যদি সলিড বল না হয়, তাহলে কণা আসলে কি? এই বইয়ের বাকিটা এই নিয়ে আলোচনায় যাবে। কিন্তু একটা স্পয়লার দিয়ে রাখি - কণা সত্যি সত্যি কি জিনিস আমরা কেউ জানি না!

৫।
খুব ছোটবেলায় ডিজনির একটা বইয়ে কয়েকটা লাইন পড়েছিলাম, খুব বলতে ইচ্ছা করছে।

“ততদিনে পার হয়ে গিয়েছিলো আঠারোটি বছর। পৃথিবী আর আকাশের তারারা তখন এক সারিতে এসে দাড়িয়েছিল। ঠিক যেমন তিন ভাগ্যদেবী গণনা করে বলেছিল।
এতকাল পর হ্যাডসের চেষ্টা সফল করে চলল।

হ্যাডস বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে দিলো টাইটানদের। ছাড়া পাওয়া মাত্র ভয়ংকর হয়ে উঠল তারা। আক্রমণ করলো অলিম্পাস পাহাড়!”

স্টার্ন আর গারল্যাক সুপ্ত, অবাস্তব, অসম্ভব ইলেকট্রনের গোপন দুনিয়ায় হানা দিয়েছেন। জেগে উঠেছে ঘুমন্ত দানব।
এরপর আর পৃথিবী কোনদিন আগের মত হবে না।

এরকম আরো বই পেতে ভিজিট করুন।
https://www.purepdfbook.com